আদর্শবাদ ও মানুষের সংকট

গোলাম মুরশিদ

অন্য পাঁচটা জন্তু থেকে মানুষ সম্ভবত দুটি জায়গাতেই সবচেয়ে ভিন্ন – শিক্ষায় এবং আদর্শে। মানুষ কেবল শিক্ষিত নয়, সেই শিক্ষাকে সে নানা রকমের মাধ্যম দিয়ে আয়ত্ত করার, ধরে রাখার এবং এগিয়ে নেবার ব্যবস্থা করতে পেরেছে। অন্য জন্তুদের জ্ঞান অথবা বুদ্ধি নেই, তা নয়। কিন্তু তারা শিক্ষাকে এমন আনুষ্ঠানিক এবং পদ্ধতিগত চেহারা দিতে পারেনি। এ ক্ষেত্রে তাই জন্তুদের থেকে মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার না-করে পারা যায় না। তবে শিক্ষার চেয়েও জন্তুদের সঙ্গে মানুষের বড়ো পার্থক্য আদর্শের। কারণ, জন্তুদের আদর্শ আছে – অন্তত এমন কথা কেউ বলেননি।

পারিপার্শ্বিক অবস্থা দেখে এবং আর-পাঁচটা বস্তু এবং ব্যক্তির সঙ্গে তুলনা করে মানুষ একটা উন্নততর এবং শ্রেয়তর অবস্থান নিতে চেষ্টা করে। কতোগুলো মূল্যবোধের সমন্বয়ে সে জীবনাচরণের একটা আদর্শ গড়ে তোলে। সেই আদর্শ একটা বিশেষ সমাজ অথবা গোষ্ঠীর মধ্যে ব্যাপ্ত হতে পারে। এমন কি, তেমন প্রেরণামূলক আদর্শ হলে তা একটা দেশ অথবা কতোগুলো দেশের লোকের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়তে পারে। এই আদর্শ সমষ্টিগত আদর্শ। এই আদর্শ একটা সমাজের ব্যক্তিদের মধ্যে বন্ধনের সূত্র হিশেবে কাজ করে এবং তার ভিত্তিতেই সেই সমাজ টিকে থাকে। আবার কোনো কোনো লোকের নিজস্ব আদর্শও থাকে, যে-আদর্শ যে-সমাজে সে বাস করে সে সমাজের সামগ্রিক আদর্শ থেকে কমবেশি ভিন্ন। কিন্তু কোনো আদর্শই অবিচল অথবা প্রশ্নাতীত নয়। অনেক সময়ে সে বিকৃত হয়ে সমালোচনার বস্তুতে পরিণত হয়। তখন প্রয়োজন দেখা দেয় সংস্কারের। এভাবে কালে কালে তার বিবর্তন হয়। এক-এক সমাজে তার চেহারা বদলে যায়। এক-এক ব্যক্তি তার ভিন্নভিন্ন ব্যাখ্যা দিতে আরম্ভ করে। ফলে নতুন আদর্শ গড়ে ওঠে। পুরোনো আদর্শের সঙ্গে তার সংঘাত শুরু হয়। সভ্যতার ইতিহাস আদর্শের এই ভাঙা-গড়ারই ইতিহাস।

আদর্শের ভেতরে একটা অন্তর্নিহিত বিরোধ রয়েছে। সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে যে-আদর্শের জন্ম, সেই আদর্শই আবার মানুষকে অন্ধ করে দেয়। সে তখন তার আদর্শের বাইরে যা আছে, তাকে অস্বীকার করতে অথবা নিম্নতর বলে বিবেচনা করতে শুরু করে। আদর্শায়িত দৃষ্টিভঙ্গি অনেক সময়েই একপেশে দৃষ্টিভঙ্গি। উৎসাহী আদর্শবাদ একই কারণে উগ্র, এমন কি, সহিংস আদর্শে পরিণত হতে পারে। ভিন্ন আদর্শের দিকে শ্রদ্ধার সঙ্গে তাকানোর উদারতা তখন লোপ পাওয়া সম্ভব।

শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে নিরন্তর নিজের প্রজ্ঞা দিয়ে আদর্শ গড়ে তুললেও, মানুষ আদর্শ মানুষ হয়ে উঠতে পারেনি। কারণ আদর্শবাদ মানুষকে বিভিন্ন গোষ্ঠীতে বিভক্ত করে। যে-আদর্শ মানুষকে মনুষ্যত্ব দান করে, সেই আদর্শই আবার মানুষে মানুষে বিরোধিতা সৃষ্টি করে। এই বিরোধিতা এমন চরম রূপ নিতে পারে যে, একটি গোষ্ঠীর মানুষ আদর্শের নামে হিংস্র জন্তুর মতোই অন্য একটা গোষ্ঠীর মানুষকে ধ্বংস করতে পারে। রোয়ান্ডার জনগণ হুটু আর টুটসি, এই দুটি বর্ণগোষ্ঠীতে বিভক্ত। কেবল অর্থনৈতিক শোষণ এবং রাজনৈতিক অবদমন নয়, বর্ণবাদের আদর্শ এ গোষ্ঠী দুটির মধ্যে এমন পারস্পরিক বিদ্বেষের জন্ম দিয়েছিলো যে, মাত্র দু সপ্তাহের মধ্যে হুটু সম্প্রদায় টুটসি সম্প্রদায়ের পাঁচ লাখেরও বেশি মানুষকে হত্যা করেছিলো।[১] ১৯১৫ সালে তুরস্ক গণহত্যার যে-আদর্শ দেখিয়েছিলো,[২] সেই আদর্শের পথ ধরে গত প্রায় নব্বই বছরে অনেক গণহত্যাই পৃথিবীতে হয়েছে। কিন্তু দ্রুততা এবং হিংস্রতার দিক দিয়ে রোয়ান্ডার গণহত্যা সম্ভবত সবাইকে হার মানিয়েছিলো। যে-মানুষ মুগ্ধদৃষ্টিতে বিশ্বকে দেখে, যে-মানুষ অলৌকিক শক্তির কথা চিন্তা ক'রে তার মধ্য দিয়ে নিজের অলৌকিত্বের আদর্শায়িত রূপ দেখতে পায়, যে-মানুষ কবিতা লেখে, গান করে এবং যে-মানুষ ও মানুষী প্রেমের খেলায় বিভোর হয়ে নশ্বর পৃথিবীতেই "স্বর্গ" রচনা করে, সেই মানুষই আদর্শের খাতিরে হিংস্রতায় সমস্ত জন্তুকে হারিয়ে দিতে পারে। তা ছাড়া, আদর্শকে

বাস্তবায়িত করার জন্যেও মানুষ অনেক ক্ষেত্রে এমন পন্থা অবলম্বন করে যে, লক্ষ্য উৎকৃষ্ট হওয়া সত্ত্বেও সেই পন্থা সমর্থনের অযোগ্য হয়ে পড়ে। বস্তুত, আদর্শ তেমন অবস্থাতে হতে পারে রীতিমতো মানবতার পরিপন্থী। এ রকমের কয়েকটি শক্তিশালী আদর্শ হলো ধর্ম, জাতীয়তা, বর্ণবাদ, এবং রাজনৈতিক মতবাদ। এর মধ্যে যে-আদর্শ কমবেশি সব মানুষকে প্রভাবিত করেছে, তা হলো ধর্ম।

ধর্মীয় আদর্শবাদ

ধর্ম কথাটার সৃষ্টি ধৃ ধাতু থেকে। যাকে ধারণ করে মানুষ মানুষ হয়ে ওঠে তাই ধর্ম। মানুষের যা স্বভাব এবং প্রকৃতি তাই মানুষের ধর্ম। কিন্তু এই ধর্ম এবং যাকে রিলিজিয়ন বলে সেই প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম অভিন্ন নয়। প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম মানুষের উদ্ভাবিত একটা সমষ্টিগত আদর্শ। সেই ধর্মের একটা মস্ত কাজ হলো মানুষকে একটা প্রচলিত মূল্যবোধের আওতার মধ্যে নিয়ে আসা এবং সেই মূল্যবোধের পরিধির মধ্যে তাকে ধরে রাখা। সেই মূল্যবোধ অনুযায়ী একটা বিশেষ সমাজ যাকে পাপ অথবা অন্যায় বলে গণ্য করে, ধর্ম সেই সেই পাপ থেকে সেই সমাজের সদস্যদের বিরত রাখে এবং সেই মূল্যবোধ অনুযায়ী যা ভালো অথবা পুণ্য বলে বিবেচিত, সেই কাজে তাদের উৎসাহিত করে। শুধু তাই নয়, জীবনের অন্তর্নিহিত অর্থ উপলব্ধি করতে এবং প্রাত্যহিক জীবনের ঊর্ধ্বে জীবনের একটা গভীরতর তাৎপর্য খুঁজতেও ধর্ম মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে।

এ ছাড়া, প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম তার অনুসারীদের ভৌগোলিক, নৃতাত্ত্বিক এবং গোষ্ঠীগত সীমানাকে অতিক্রম করে ঐক্যবদ্ধ করতেও সহায়তা করে। যেমন, অতীতে বৌদ্ধধর্ম ইন্দোনেশিয়া থেকে আফগানিস্তান পর্যন্ত বিশাল ভূ-ভাগের মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করার প্রয়াস পেয়েছিলো। উত্তরে চীন এবং সুদূর উত্তর-পুবে জাপান পর্যন্ত পরে সেই ঐক্যের পরিধিতে ধরা দিয়েছিলো। খৃস্টীয় ধর্ম নানা দেশের নানাভাষী নানাবর্ণের মানুষকে ভ্রাতৃবন্ধনে আবদ্ধ করতে সমর্থ হয়েছে। প্রচারিত হওয়ার কয়েক শতাব্দীর মধ্যে ইসলাম ধর্মও মধ্যপ্রাচ্য এবং উত্তর আফ্রিকার নানা দেশকে এক পতাকার তলে নিয়ে এসেছিলো। তার চেয়েও বড়ো কথা, আফ্রিকার কৃষ্ণাঙ্গ মানুষকেও সামাজিক সুবিচার এবং ভ্রাতৃত্বের আদর্শ দিয়ে আকৃষ্ট করেছিলো। আর সাম্প্রতিক কালে ইসলামী ভ্রাতৃত্ব বোধ আরও বৃহত্তর এলাকার পরস্পরবিরোধী স্বার্থের জালে বন্দী বিচিত্র জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী নানা দেশের জনগণকে এক ধরনের প্যান-ইসলামী বন্ধনে আবদ্ধ করেছে। দেশের রাজনৈতিক সীমানাকে অতিক্রম করে সে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মুসলমানদের মধ্যে একটা অভিন্ন আত্মপরিচয়ের জন্ম দিয়েছে। কেবল ঐক্যবোধের লালন নয়, ধর্ম সমষ্টিগত মঙ্গলেও একটা মানবগোষ্ঠীকে উৎসাহিত করতে পারে।

অন্যদিকে, ধর্ম আবার বিধর্মীদের সঙ্গে, অর্থাৎ ভিন্ন ধর্মের অনুসারীদের সঙ্গে বিভেদের দেওয়াল তুলে দিতে পারে। তার ফলে, যে-ধর্ম অন্য মানুষকে ভালোবাসার কথা বলে, সেই ধর্মই অন্য একজন মানুষের প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি করতে পারে এবং সামগ্রিকভাবে মানব সমাজের মধ্যে বিরোধের বীজ বপন করতে পারে। একই সমাজ এবং দেশের মানুষের মধ্যে যে-যোগাযোগ ও সহযোগিতা বাঞ্ছিত এবং শ্রেয়, তাকেও বিচ্ছিন্ন অথবা বিপন্ন করতে পারে। এমন কি, পারে হানাহানির সৃষ্টি করতে। যিশু খৃস্ট প্রেমের বাণী প্রচার করলেও, এবং হজরত মোহাম্মদ তাঁর ধর্মের নাম শান্তি রাখলেও, ধর্মের নামে খৃস্টান ও মুসলমানদের যুদ্ধ বহু শতাব্দীর। এখনো উভয় ধর্মের অনুসারীরা একে অন্যকে সন্দেহের চোখে দেখে। আর, মুসলমান এবং ইহুদীদের চরম বিরোধ এখনো বর্তমান। হিন্দু এবং মুসলমানের নিত্য কলহ চলছে উপমহাদেশে। এমন কি, সাম্প্রতিক কালে ভারতে হিন্দু আর খৃস্টানদের মধ্যে তীব্র হানাহানি দেখা দিয়েছে। ভারতে খৃস্টান শিশুদের গাড়িতে বন্দী করে পুড়িয়ে মারতে অথবা ঘুমন্ত ধর্মযাজককে মেরে ফেলতে কট্টর জাতীয়তাবাদী হিন্দুদের বিবেকে আটকায়নি। পড়শি দেশ পাকিস্তানে গীর্জার ওপর আক্রমণ করে উপাসনারত খৃস্টানদের মেরে ফেলতে বিবেকে বাধেনি শান্তির ধর্মের অনুসারী মুসলমানদের। এমন কি, সে দেশে এক সম্প্রদায়ের মুসলমানের সঙ্গে অন্য সম্প্রদায়ের মুসলমানের নির্মম হানাহানি দেখা দিয়েছে।

ধর্মের নামে মানুষ যে কিভাবে পশুর চেয়েও অধম হতে পারে, তার অতি-সাম্প্রতিক দৃষ্টান্ত দেখা গেছে গুজরাটে। সে রাজ্যে নারী এবং শিশু-সহ হিন্দুদের জীবন্ত পুড়িয়ে মারতে মুসলমান দুস্কৃতকারীদের দ্বিধা হয়নি, অথবা হিন্দু ঘাতকদের আটকায়নি শিশু, নারী এবং বৃদ্ধসহ শত-শত মুসলমানকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারতে। সত্যি বলতে কি, ধর্মীয় জাতীয়তাবাদ থেকে যে-ঘৃণাবোধের জন্ম, তা এই খুনীদের মনুষ্যত্ব লোপ করে দিয়ে জন্তুর চেয়েও অধম জন্তুতে পরিণত করেছে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে বিধর্মী সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলোর ওপর

অত্যাচার আগের তুলনায় অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৮৪ সালে হিন্দু এবং শিখদের দাঙ্গায় তিন হাজারেরও বেশি শিখ নিহত হয়েছিলো। আর, নাগাল্যান্ডে নিহত খৃস্টানের সংখ্যা, অনেকের মতে, তিন লাখ।

ভারতের মতো অতিসাম্প্রতিক কালে এশিয়া এবং আফ্রিকার অন্য বহু দেশেও ধর্মীয় সহনশীলতার অভাব প্রকট হয়ে উঠেছে। বিশেষ করে মুসলমানদের মধ্যে এই মনোভাব লক্ষণীয় মাত্রায় বৃদ্ধি পেয়েছে। মুসলমানরা অন্য ধর্মাবলম্বীদের বিশেষ করে খৃস্টান এবং ইহুদীদের শত্রু চিহ্নিত করে তাদের বিরুদ্ধে, বলতে গেলে, যুদ্ধ শুরু করেছে। পুবে ইন্দোনেশিয়া এবং ফিলিপাইনস থেকে শুরু করে পশ্চিমে সুদান এবং নাইজেরিয়া পর্যন্ত বহু দেশেই খৃস্টান এবং মুসলমানদের হানাহানি তীব্র হয়ে দেখা দিয়েছে। বিশেষ করে মুসলমান মৌলবাদীরা মধ্যপ্রাচ্য এবং উত্তর আফ্রিকার দেশগুলোতে উগ্রবাদের, এমন কি, সন্তাসের জোয়ার বইয়ে দিয়েছে। ফলে, কিছুকাল আগে পর্যন্ত পশ্চিমা জগৎ কমিউনিজমকে যেমন তাদের শত্রু বলে গণ্য করতো, তেমনি এখন ইসলামকেও সন্দেহের চোখে দেখতে শুরু করেছে। অনেকে তাকে সভ্যতা এবং আধুনিকতার শত্রু বলেও শনাক্ত করছে। যে-ধর্ম সামাজিক সাম্য, মৈত্রী এবং ভ্রাতৃত্বের শিক্ষা দেয়, সেই ধর্মীয় উন্মত্ততায় মনুষ্যত্ব এখন বিপন্ন। কিন্তু, কি আশ্চর্য, এই ঘোর উন্মত্ততাকে এই ধর্মবাজরা ধর্মযুদ্ধ বলে গণ্য করছে। এবং ধর্মের নামে মানবিকতা বিসর্জন দিয়ে তারা অন্য মানুষকে, এমন কি নিরপরাধ মানুষকে পাইকারীভাবে হত্যা করতে দ্বিধা বোধ করছে না। পাপ বোধ করা দূরে থাক, তারা বরং মনে করে যে, এসব অমানুষিক বর্বর নৃশংসতা দিয়ে তারা পুণ্য অর্জন করছে।

বস্তুত, ধর্মের নামে কেবল অন্য ধর্মের অনুসারীদের ওপর অত্যাচার চলছে তাই নয়, ধর্মের নামে স্বধর্মীদের ওপর অত্যাচার করার দৃষ্টান্তও দেখতে পাচ্ছি ভূরি-ভূরি। উত্তর আয়ারল্যান্ডে খৃস্টানে খৃস্টানে হানাহানির চলছে দীর্ঘকাল ধরে। এমন কি, অতি সম্প্রতি এ রকমে নজির সৃষ্টি করেছে পাকিস্তানের উগ্রপন্থী জেহাদীরা আর আফগানিস্তানের কট্টর ইসলামী শাসকরা। পাকিস্তানের সিপাহী সাবারা কখনো কাদিয়ানীদের ওপর, কখনো শিয়াদের ওপর যেভাবে আক্রমণ চালিয়েছে, তাতে এই হামলার প্রতি ধর্মের অনুমোদন আছে, এ কথা বললে ধর্মের অপমান করা হয়। ধর্মের জোশে উন্মাদ হয়ে অন্য সম্প্রদায়ের মসজিদের ওপর গুলি চালাতে অথবা বোমাবাজি করতেও এরা কুণ্ঠিত হয়নি।

অপর পক্ষে, আফগানিস্তানে ধর্মের নামে তালিবানরা সমস্ত শিক্ষা এবং মৌলিক অধিকার থেকে নিজেদের দেশের অর্ধেক মানুষ অর্থাৎ নারীদের বঞ্চিত করেছিলো। উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে নিজেরা অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করলেও, সাধারণ মানুষের জন্যে সে দেশে তারা টেলিভিশন পর্যন্ত নিষিদ্ধ করেছিলো। যে-গানকে পৃথিবীর বেশির ভাগ ধর্মেই মনে করা হয় উপাসনার একটা অঙ্গ হিশেবে, যে-গান শোকে-দুঃখে, আনন্দ-উৎসবে, প্রেমে-বিরহে, আমাদের মনে এই পৃথিবীতেই অপার্থিব অনুভূতি দিতে পারে, সেই গান শোনাও নিষিদ্ধ ছিলো আফগানিস্তানে। এমন কি, পুরুষ হলে দাড়ি গজানো ছিলো বাধ্যতামূলক। সেই দাড়ি ঠিকমতো লম্বা হচ্ছে কিনা, তাও মেপে দেখার লোক ছিলো। কিন্তু দেশের অসংখ্য গরিবদের দু বেলা খাবার জুটছে কিনা, তা দেখার মতো লোক ছিলো না। ত্রাসের রাজত্ব সৃষ্টি করার নমুনা স্তালিন এবং পল পটও সৃষ্টি করেছিলেন। কিন্তু অত্যাচারী শাসনের মাধ্যমে ঘড়ির কাঁটা পিছিয়ে দেওয়ার এমন নমুনা তালিবানরা স্থাপন করেছিলো, যার কোনো তুলনা নেই। স্তালিন এবং পল পট তাঁদের ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করার পেছনে যুক্তি দিয়েছিলেন মানব-কল্যাণের; আর তালিবানরা এ সবই করেছিলো বাহ্যত প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের নামে, কিন্তু মূলত নিজেদের ক্ষমতাকে স্থায়ী করার উদ্দেশে।

ধর্মের দোহাই দিয়ে তালিবানরা যা করেছে, তাকে অবশ্য কোনো মতেই একক বা অভূতপূর্ব বলা যায় না। এর আগেও স্বার্থবাদী মহল অসংখ্য বার ধর্মের নাম দিয়ে ত্রাস সৃষ্টি করেছে, মানুষের ওপর নির্যাতন চালিয়েছে। দৃষ্টান্তের জন্যে দূরে যাওয়ার দরকার নেই। ১৯৭১ সালে পাকিস্তান ধর্মের দোহাই দিয়ে, কিন্তু আসলে নিজেদের ঔপনিবেশিক শাসনকে স্থায়ী করার লক্ষ্যে তখনকার পূর্ব পাকিস্তানের লাখ-লাখ লোককে হত্যা করেছিলো। ধর্ষণ করেছিলো লাখ-লাখ মহিলাকে। পুড়িয়ে দিয়েছিলো অসংখ্য বাড়িঘর। আর পরের সম্পত্তি লুণ্ঠনের ঘটনা কতো ঘটেছিলো তার কোনো হিশেব নেই। একজন লেখকের মতে, পাকিস্তানের সৈন্যরা যে নিজেদের জীবনের নিরাপত্তা পর্যন্ত অগ্রাহ্য করে অমন পশুর মতো অত্যাচার করতে পেরেছিলো, তার একটা কারণ, তাদের বোঝানো হয়েছিলো যে, ধর্মের নামে তারা যা করবে, তাতে বিজয়ী হলে তারা স্বর্গে যাবে, এমন কি মৃত্যু হলেও তারা স্বর্গে যাবে। তা ছাড়া, যে-বিধর্মীদের বিরুদ্ধে তারা লড়াই করছে, তাদের নারী এবং সম্পত্তির ওপরও তাদের অধিকার ধর্মসম্মত। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, বিধর্মী বলে যাদের চিহ্নিত করা হয়েছিলো, তারা কেবল হিন্দু, বৌদ্ধ অথবা খৃস্টান ছিলো না,

বেশির ভাগই ছিলো মুসলমান।

বস্তুত, অনেক সংগঠিত ধর্মীয় গোষ্ঠীই মনুষ্যত্বের চেয়ে বেশি ঝোঁক দেয় আচার-অনুষ্ঠানের প্রতি, প্রাতিষ্ঠানিকতার প্রতি। সত্যি বলতে কি, এ রকমের বহু সংগঠিত ধর্মই ঈশ্বরে মানুষের বিশ্বাস অথবা আধ্যাত্মিকতার প্রতি তার প্রেম জাগিয়ে তুলতে চেষ্টা করে না। এমন কি, ধর্মগ্রন্থের মূল বাণীর প্রতি শ্রদ্ধাও জাগিয়ে তোলে না। বরং ধর্মের আনুষ্ঠানিকতা, জড় বিধান, আচার-ব্রত ইত্যাদিকে সদৃঢ় করে তোলে। এবং তার ফলে জ্ঞাতে-অজ্ঞাতে গড়ে ওঠে এক ধর্মের সঙ্গে অন্য ধর্মের বিভেদের দেওয়াল। জাতি-পাঁতি, ছোঁওয়া-ছুঁয়ি, দাড়ি-টীকির ব্যবধান তৈরি হয়। বস্তুত, প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মে বিশ্বাসী মানুষ ধর্মীয় বিধানের প্রতি যতোটা আনুগত্য দেখায়, মানবিক গুণাবলী অথবা মানব-কল্যাণের প্রতি ততোটা প্রীতি প্রকাশ করার প্রয়োজন বোধ করে না। মানবিকতার প্রতি তার আনুগত্য বড়োজোর ওষ্ঠ-গভীর। সততা, সত্যবাদিতা, পরোপকার, ন্যায়নিষ্ঠা, সেবা, শ্রদ্ধা ইত্যাদি গুণাবলীর চেয়ে ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালনকেই সে বেশি শ্রেয় বলে গণ্য করে।

সম্প্রতি আলজেরিয়ার চরম ডানপন্থী একটি জঙ্গীবাদী দল তরুণদের দলভুক্ত করার উদ্দেশে একটি প্রচারমূলক ভিডিও প্রকাশ করেছে। তাতে বলা হয়েছে, সৃষ্টিকর্তার নামে খুন করো। যতক্ষণ না তুমি নিজে নিহত হচ্ছো ততোক্ষণ খুন করো। তুমি যদি এভাবে নিহত হও, তা হলে সৃষ্টিকর্তা তোমার ওপর খুশি হবেন এবং চিরকালের জন্যে তোমার জায়গা হবে স্বর্গে। (যে-স্বর্গে খাদ্য এবং সুন্দরী নারীর সীমাহীন সরবরাহ থাকবে।) অন্য ধর্মের অনুসারীদের উলে-খ করে এই ভিডিওতে বলা হয়েছে যে, তারা যা করছে, তা সৃষ্টিকর্তার নামে করছে না, করছে শয়তানের নামে। যে বাণী এই ভিডিওতে প্রচার করা হয়েছে, তাকে নিতান্ত সংকীর্ণ এবং বিভেদমূলক না-বলে অন্য কিছু বলা যায় না। এই ভিডিওতে যেভাবে সৃষ্টিকর্তা এবং অন্য ধর্মাবলম্বীদের চিহ্নিত করা হয়েছে, তাতে বিশ্বাসীদের এমনটা মনে হতে পারে যে, এই ধর্মের অনুসারীদের যে-সৃষ্টিকর্তা সৃষ্টি করেছেন, অন্য মানুষদের সেই একই সৃষ্টিকর্তা সৃষ্টি করেননি। এই সংজ্ঞা অনুযায়ী সৃষ্টিকর্তাও সাম্প্রদায়িক। তা ছাড়া, এই ভিডিওতে যেভাবে নিজের এবং অন্যদের জীবনের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করে জীবন বিসর্জনকে উৎসাহিত এবং গৌরবান্বিত করা হয়েছে, তা উচ্চ আদর্শের দৃষ্টান্ত বলে বিবেচিত হতে পারে না।

বস্তুত, গোড়াতে ধর্মের যে-ভূমিকা ছিলো এখন মানবসমাজে ধর্ম সেই ভূমিকা পালন করছে কিনা, অথবা পালন করতে পারছে কিনা, সে বিষয়ে সন্দেহ দেখা দিয়েছে। কারণ ধর্ম এখন অনেক ক্ষেত্রেই আধ্যাত্মিকতার বাহন নয়। ধর্ম এখন অনেকের কাছে ক্ষমতা লাভের একটা হাতিয়ার। ধর্মপ্রচারকদের উদ্দেশ্য গোড়াতে যাই থাক না কেন, ধর্মের নামে এখন যাঁরা নেতৃত্ব দিচ্ছেন, তাঁরা অন্য পাঁচটা মতবাদের মতোই ধর্মের নাম ভাঙিয়ে নিজেরা ফয়দা লুটতে চান। নিজেদের শক্তিকে স্থায়ী করতে চান। মার্কসবাদকে কাজে লাগিয়ে ক্ষমতা দখল করার সময়ে অথবা ক্ষমতাকে কুক্ষিগত করার চেষ্টা থেকে কোনো কোনো কমিউনিস্ট নেতা যেমন অসংখ্য লোককে মেরে ফেলতে অথবা তাঁদের রাজনৈতিক বিরোধীদের সরিয়ে দিতে কুণ্ঠিত হননি, ধর্মের নেতৃত্ব যাঁরা নিজেদের হাতে তুলে নিয়েছেন, তাঁরাও তেমনি অগণিত মানুষকে হত্যা করতে দ্বিধা করেননি অথবা দ্বিধা করছেন না।

সত্যের জন্যে যদি কেউ নিজের জীবন বিসর্জন দেয়, সেটাকে প্রশংসা না-করে পারা যায় না। কিন্তু ধর্মের নাম ভাঙিয়ে ক্ষমতা দখলের অথবা ক্ষমতা টিকিয়ে রাখার জন্যে কেউ জীবন দিলে তাকে ধর্মযুদ্ধ বলা সঙ্গত নয়। অথবা সেই যুদ্ধের নাম করে অন্যের জীবনহানি করলে তাকে জঘন্যতম হত্যা না-বলে অন্য কিছু বলা যায় না। বিপ-ব-পরবর্তী কালে ইরানে যেসব হানাহানি হয়েছিলো, তা ধর্মীয় নেতার উস্কানিতেই হয়েছিলো। এবং তাকে অধর্ম ছাড়া অন্য কিছু বলা যায় কি? তেমনি, বিশ্ববাণিজ্য কেন্দ্রের ওপর আক্রমণ করে শিশু এবং বৃদ্ধ-সহ হাজার হাজার নিরপরাধ নরনারীর প্রাণহানি করার মধ্যে কোনো বীরত্ব ছিলো বলে মনে করা শক্ত, তাতে তার পক্ষে ধর্মীয় অথবা জাতীয়তাবাদী যুক্তি যা-ই দেওয়া হোক না কেন। বিশ্ববাণিজ্য কেন্দ্রের ওপর দুটি বিমান বিধ্বস্ত করে যে-বীরপুঙ্গবরা "শহীদ" হয়েছিলো, তাদের একজন নেতা লিখে রেখে গেছে, কিভাবে আঘাতের ঠিক পূর্ব মুহূর্তে নিজের বুক উঁচু করে সৃষ্টিকর্তার শ্রেষ্ঠত্বের কথা ঘোষণা করতে হবে। কিন্তু সেই দুটি বিমানের একটিতে ছিলো স্কটল্যান্ডের একটি কমবয়সী মা এবং তার আড়াই বছরের ছেলে। ধাক্কা লাগার আগের মুহূর্তে তারা কি বলবে, এই বীরপুঙ্গব তা লিখে রেখে যায়নি।

খুব সম্ভব মহাকাব্যের কল্পিত নায়ক রাম। এই মহাকাব্যের বর্ণনা অনুযায়ী তাঁর জন্মস্থান অযোধ্যায়, যদিও সেই

বর্ণনা থেকে তাঁর জন্মের জায়গাটিকে একেবারে সুনির্দিষ্ট করে কয়েক শো গজের মধ্যে চিহ্নিত করা যায় কিনা, তা নিয়ে অবশ্যই বিতর্ক থাকতে পারে। কিন্তু বিশ্ব হিন্দু পরিষদ কেবল সেই জায়গাটি খুঁজে বের করেনি, বরং তারা সেখানে একটি চার শো বছরের পুরোনো একটি মসজিদও আবিষ্কার করেছে। দেবতার জন্মস্থানের ওপর বিধর্মীদের ভজনালয় থাকতে দেওয়া আর যাই হোক কোনো উৎসাহী ধর্মাবলম্বীর পক্ষে সহ্য করা অসম্ভব। সুতরাং বাবরি মসজিদ ভেঙে ফেলার দাবি একটা রাজনৈতিক বিতর্কে পরিণত হয়। ধীরে ধীরে একে কেন্দ্র করে একটা কট্টর জাতীয়তাবাদী আন্দোলনও গড়ে ওঠে। অতঃপর দুর্বল নরসীমা রাও-এর শাসনামলে, ১৯৯২ সালের ডিসেম্বরে, অনেক ঢাকঢোল পিটিয়ে নিষ্ক্রিয় নিরাপত্তা বাহিনীর চোখের সামনে অত্যুৎসাহীরা বাবরি মসজিদ ভেঙে ফেললো।[৩] মসজিদ ইঁট-পাথর-চুন-সুরকি দিয়ে তৈরি। ভেঙে ফেলার ৪৩ বছর আগে থেকে সেখানে উপাসনাও হয়নি। সুতরাং সেই মসজিদ ভেঙে ফেললে ধর্মপ্রাণ মুসলমানরা আহত হতে পারেন। কিন্তু সে ঘটনা কেয়ামত অথবা প্রলয়ের মতো গুরুতর ঘটনা নয়। তবু সেই ঘটনার অব্যবহিত পরে যে-দাঙ্গা শুরু হয়, তাতে ভারতেরই তিন হাজার লোক নিহত হয়েছিলো। এবং এ দাঙ্গা কেবল ভারতেই সীমাবদ্ধ থাকেনি, বাবরি মসজিদ থেকে শত শত মাইল দূরে বাংলাদেশেও তার ঢেউ এসে লেগেছিলো। বিভিন্ন জায়গায় হিন্দুদের মন্দির তো পোড়ানো হয়ই, এমন কি, হিন্দুদের ওপর শুরু হয় নানা ধরনের নির্যাতন। ভোলার মতো প্রত্যন্ত অঞ্চলের হিন্দুরা বাবরি মসজিদ ভাঙার সঙ্গে প্রত্যক্ষ তো দূরের কথা, পরোক্ষভাবেও যুক্ত ছিলো না। কিন্তু তারাও এই দাঙ্গার শিকারে পরিণত হয়। তাদের ঘরবাড়ি পোড়ানো হয়। সম্পত্তি লুণ্ঠিত হয়। এমন কি, ধর্ষিতা হয় তাদের ঘরের মহিলারা। এবং বাবরি মসজিদের বিতর্ক এখানেই থেমে যায়নি। তার জের চলতে থাকে বছরের পর বছর। এর ফলে সমগ্র উপমহাদেশে সাম্প্রদায়িক মৈত্রী বিপন্ন হয়। তার চেয়েও খারাপ, এ ঘটনা বহু ধর্মভীরু মানুষকে সম্ভবত চিরদিনের জন্যে ধর্মান্ধ করে দেয়। সবচেয়ে খারাপ, এ ঘটনার ফলে ডানপন্থী রাজনীতি রাতারাতি জোরদার হয়। সত্যি বলতে কি, এ ঘটনা না-ঘটলে, কংগ্রেসের নপুংষকতা সত্ত্বেও ভারতে ডানপন্থী বিজেপি ক্ষমতায় আসতে পারতো কিনা, সন্দেহ করি। একবার ক্ষমতায় আসার পর সেই ক্ষমতাকে আঁকড়ে রাখার উদ্দেশে বিজেপি কোমর বেঁধে সেই ধর্মের নামই ব্যবহার করতে শুরু করে। একদিকে, তারা বিশ্বহিন্দু পরিষদ, শিবসেনা এবং আর. এস. এসকে কাজে লাগিয়ে হিন্দু জাতীয়তাবাদকে যদ্দুর সম্ভব প্রবল করে তোলে। অন্যদিকে, ভারতের উদার ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্তিক সংবিধানকে পর্যন্ত বদলে দেওয়ার উদ্যোগ নেয়। আরও শোচনীয়, তারা কিছু তথাকথিত চরিত্রহীন বুদ্ধিজীবীর সহায়তায় নতুন করে ইতিহাস লেখার অর্থাৎ বিকৃত করে ইতিহাস রচনার কাজ আরম্ভ করে।

বাবরি মসজিদ ভেঙে সেখানে রামমন্দির নির্মাণের জাতীয়তাবাদী উদ্যোগের সর্বসাম্প্রতিক প্রতিক্রিয়া ঘটে ২০০২ সালের ফেবরুআরিতে। নতুন করে রামমন্দির নির্মাণের কর্মসূচী নিয়ে সক্রিয় ধর্মান্ধরা অযোধ্যায় গিয়ে করসেবার মাধ্যমে এই মন্দির নির্মাণে সহায়তা করার উদ্যোগ নেয়। কিন্তু তারা যখন ট্রেনে করে অযোধ্যায় যাচ্ছিলো, তখন গুজরাটের একদল ধর্মান্ধ মুসলমান এই ট্রেনে আগুন লাগিয়ে ৫৮ জন হিন্দুকে জ্যান্ত পুড়িয়ে মারে। তাদের মধ্যে নারী এবং শিশুও ছিলো। দুদিনের মধ্যে তার যে-প্রতিক্রিয়া হয় দোসরা মার্চের (২০০২) গার্ডিয়ান পত্রিকায় লিউক হার্ডিং-এর লেখা প্রতিবেদনে তার সামান্য পরিচয় মেলে:

> "অপরাহ্নে ক্রুদ্ধ জনতা আহসান জাফরির বাড়ির আঙিনায় ঢুকে পড়ে। তারা তাঁর দোতলা বাড়ির জানালার ফাঁক দিয়ে কেরোসিন ঢেলে দেয়। লোকসভার এই সাবেক মুসলিম সদস্য কংগ্রেস দলের হয়ে উলে-খযোগ্য সেবা করেছিলেন। তিনি সাহায্য চাইতে চেষ্টা করেন। কিন্তু নিরুপায় হয়ে তিনি টেলিফোনে যে-সাহায্য প্রার্থনা করছিলেন, পুলিশ তাতে কোনো সাড়া দেয়নি। তারপর আত্মরক্ষা করতে গিয়ে এক পর্যায়ে মি জাফরি যখন তাঁর পিস্তল দিয়ে শূন্যে ফাঁকাওয়াজ করেন, তখন হাজার দশেক লোকের সেই হিন্দু জনতা তাঁর বাড়ির ওপর আক্রমণ করে তাঁকে টেনে রাস্তায় নামায়।
>
> তাঁর মাথার ওপর প্যারাফিন ঢেলে দিয়ে তাঁর শরীরে যখন আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়, তাঁর আগেই তিনি নিহত হয়েছিলেন কিনা, সে সম্পর্কে কেউই নিশ্চিত নয়। জনতা তাঁর শ্যালক, শ্যালকের স্ত্রী এবং তাঁদের দুটি ছোটো ছেলেকেও বাড়ি থেকে টেনে বের করে পুড়িয়ে মারে।
>
> আহমেদাবাদের চমনপুরায় মুসলমানদের একটি ছোট্টো এলাকার চারদিকে বিরাট সংখ্যক হিন্দুদের বসবাস। গতকাল সেই চমনপুরা নরকের চেহারা নিয়েছিলো। মি জাফরির বাড়ির বাইরে একটি চিতায় ছিলো পুড়ে কালো-হয়ে-যাওয়া ছোট্টো একটি হাত, তখনও মুষ্ঠিবদ্ধ। জাফরির নাম-ফলকটি পড়ে ছিলো এক গাদা

আধ-পোড়া বই আর মানুষের চুলের পাশে। গুলবাগ হাউসিং সোসাইটির সবার ভাগ্যই হয়েছিলো মি জাফরির মতো। তাদের পোড়া বাড়ির বাইরে হিন্দু জনতা এসে গতকাল ভিড় করেছিলো। সেখানে বেশি কিছু দেখার ছিলো না। বাইসাইকেলের চাকা আর গদির সঙ্গে পেঁচিয়ে পড়ে ছিলো মানুষের বেঁকে যাওয়া মেরুদণ্ড।

নগরের হিন্দু পুলিশ বাহিনীর নিক্রিয়তার দরুণই এই হত্যাযজ্ঞ সম্ভব হয়েছিলো। হিন্দু জনতা মুসলিম এলাকায় যে-ধ্বংসলীলায় মেতে উঠেছিলো পুলিশ নির্বিকার দর্শকের মতো তা কেবল প্রত্যক্ষ করেছিলো। 'আমাদের মেরে ফেলছে! দোহাই আপনাদের, আমাদের এই নরক থেকে রক্ষা করুন!' মিনতি করে বলেছিলো দিশু বানাশেক নামে একজন মুসলমান। 'ওরা আমাদের ওপর গুলি করছে। আমাদের মেয়েদের কয়েকজনকে এরই মধ্যে ওরা ধর্ষণ করেছে। দোহাই, আপনারা আমাদের সাহায্য করুন।'

পরবর্তী কদিনের মধ্যে এতো মুসলমান পুড়িয়ে হত্যা করা হয় যে, কেবল ৫৮জন হিন্দুকে পুড়িয়ে মারার প্রতিশোধ নেওয়ার ইচ্চা থাকলে, সে সাধ বহু আগেই মিটে যাওয়ার কথা ছিলো। কিন্তু মুসলমান পোড়ানোর তৎপরতা চলতেই থাকে বিশেষ করে বিজেপির মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর অনুমোদনে। তাঁর নাম নরেন্দ্র অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ নর না-হয়ে অন্য কিছু হলেই বেশি মানানসই হতো। সে যাই হোক, যে-স্বল্পসংখ্যক পুলিশ কর্মকর্তা দাঙ্গা দমনের জন্যে উদ্যোগ নেন, তাঁদের চাকরি চলে যাওয়া ছাড়া, পুলিশ বাহিনীর আর কোনো অসুবিধেয় পড়তে হয়নি, অথবা গুজরাটে তাদের সমালোচনাও হয়নি। এক মাসের মধ্যে মৃতের সংখ্যা দু হাজারে পৌঁছলেও, ভারতের প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ী নিজের নাম সার্থক করে ধৈর্যে অটল থাকেন। মুখ্যমন্ত্রী মোদীর ওপর তাঁর আস্থাও অটল থাকে। দাঙ্গা শুরু হওয়ার পাঁচ সপ্তাহ পরে বাজপেয়ী প্রথম সরেজমিনে দাঙ্গা-পীড়িত এলাকা দেখতে বের হন। অনেকে বলেন যে, দাঙ্গার দিকে পিঠ ফিরিয়ে রাখা ছাড়া, তাঁর কোনো উপায় ছিলো না। কারণ, এই দাঙ্গা শুরু হওয়ার ঠিক আগে যে-চারটি রাজ্যে বিধান সভার নির্বাচন হয়েছিলো, তাতে বিজেপি ভালো ফল করতে পারেনি। রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদের মতে, ধর্মীয় জাতীয়তাবাদ-প-াবিত দেশে এই দাঙ্গা বিজেপির ভাগ্য ফেরাবে বলে মনে করা হচ্ছিলো।

১৯৯২ সালে বাবরি মসজিদ ভাঙার পর ভারতের বিভিন্ন জায়গায় ও বাংলাদেশে এবং তার দশ বছর পরে এবারে ভারতে যেসব অমানুষিক ঘটনা ঘটেছে, সবই ঘটেছে ধর্মের নামে। ঈশ্বরে বিশ্বাসী মানুষের কীর্তি এসব। এসব হত্যাযজ্ঞে যারা মেতে উঠেছিলো, তাদের একদল উন্মত্ত হয়েছিলো একটি অব্যবহৃত মসজিদের নামে। অন্য দল মেতে ওঠে এক কল্পিত দেবতার তথাকথিত জন্মস্থানের নামে। অথচ একটি ধর্মীয় ভবন কি একটি মানুষের থেকে বেশি পবিত্র? একটি মানুষের জীবনের চেয়ে বেশি মূল্যবান? অন্তত বাঙালি কবি তা বলেননি। উদাত্ত কণ্ঠে চরম ক্ষোভের সঙ্গে তিনি বলেছিলেন: "জগতের যত পবিত্র গ্রন্থ ভজনালয় / ঐ একখানি ক্ষুদ্র দেহের সম পবিত্র নয়।"

বাবরি মসজিদের প্রসঙ্গেই মনে পড়ছে, ১৯৬৩ সালের আর-একটি ভবাবহ ঘটনার কথা। ঐ বছরের শেষে কাশ্মীরের একটি মসজিদ থেকে ইসলাম ধর্মপ্রবর্তকের পবিত্র কেশ চুরি হয় অথবা খোয়া যায়। সে কেশের ঐতিহাসিক মূল্য নিশ্চয় ছিলো। চুরি হওয়ার ঘটনাও নিঃসন্দেহে দুর্ভাগ্যজনক। কিন্তু এই চুরিকে কেন্দ্র করে উত্তর ভারতের মুসলমানরা কোনো কোনো জায়গায় নিরপরাধ হিন্দুদের হত্যা করতে শুরু করে। এই রক্তপাতের প্রতিক্রিয়ায় জব্বলপুর-সহ উত্তর ভারতের বিভিন্ন জায়গায় আরম্ভ হয় হিন্দু-মুসলমানের নজিরবিহীন দাঙ্গা। আবার, উত্তর ভারতের দাঙ্গার প্রতিক্রিয়ায় তখনকার পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন জায়গায় যে-দাঙ্গা শুরু হয়, তাও ছিলো নজিরবিহীন। ১৯৫০ সালেও পূর্ব পাকিস্তানের যেসব জায়গায় দাঙ্গা হয়নি, তেমন অনেক জায়গাতেও সেবারে দাঙ্গা হয়েছিলো। সেবারে জয়দেবপুর এবং কাওরাইদের মধ্যে ট্রেন থেকে নামিয়ে কুড়ুল দিয়ে কুপিয়ে যেভাবে বহু হিন্দুকে খুন করা হয়, তা সত্যি সত্যি রোমহর্ষক। অথচ যে-হিন্দুদের হত্যা করা হয়, তারা কেউ এই কেশ চুরির জন্যে দায়ী ছিলো না। এমন কি, এই কেশ চুরির কথা তাদের অনেকে শোনেওনি। নিরপরাধ লোকেদের প্রতিশোধমূলক হত্যা করার ঘটনাকে কোন্ ধর্মের দোহাই দিয়ে যুক্তিযুক্ত বলা যায়, আমার জানা নেই। অন্তত ইসলাম ধর্ম অনুসারে তো নয়ই। পাছে তাঁর কবর পূজা শুরু হয়, সে জন্যে ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক তাঁর কবরের ওপর কোনো আচ্ছাদন নির্মাণ করতে নিষেধ করেছিলেন। সেই ধর্মপ্রবর্তকের কেশের প্রতি মুসলমানরা যে-সম্মান দেখাচ্ছিলেন, তাকে পরোক্ষ মূর্তিপূজা ছাড়া আর-কিছু বলা যায় না। এবং সেই কেশ চুরির প্রতিশোধ নিতে গিয়ে মুসলমানরা যে-খুনখারাবি শুরু করে, তাকেও নিতান্ত অধর্মই বলতে হয়। কেশ যারই হোক, তা কোনো মানুষের জীবনের চেয়ে বেশি মূল্যবান নয়। অথবা সেই কেশের পূজাও কোনো যুক্তিপূর্ণ অথবা ধার্মিক মানুষ সমর্থন করতে পারে না।

মৌলবাদ

সাম্প্রতিক কালে ধর্ম নিয়ে যে-অতিরিক্ত উৎসাহ দেখা দিয়েছে, তা অবশ্য ভারতীয় উপমহাদেশেই সীমাবদ্ধ নেই। বিশ্বের বহু জায়গাতেই তা মহামারীর মতো ছড়িয়ে পড়েছে। বিশে-ষণ করলে দেখা যায় যে, জাতীয়তাবাদের সঙ্গে এই ধর্মীয় উৎসাহ মিলে সোনায়-সোহাগার মতো কাজ করছে। এর ফলে জাতীয়তাবাদ যেমন তীব্র হয়ে উঠেছে, ধর্মের প্রতি উৎসাহও তেমনি বাঁধ ভাঙা জোয়ারের মতো চারদিক সয়লাব করে ফেলেছে। বস্তুত, এই দুই মনোভাব সোনায় সোহাগার মতো একে অন্যের পোষকতা করেছে। ধর্ম যদি কারো ব্যক্তিজীবনে, এমন কি সমাজ-জীবনে, আধ্যাত্মিকতার বাহন হয়ে দেখা দেয়, তা থেকে কোনো অমঙ্গল সূচিত হতে পারে না; বরং তা থেকে মঙ্গলই দেখা দিতে পারে। কিন্তু ধর্মের নামে আমরা যা দেখতে পাচ্ছি, তা আসলে ধর্মীয় জাতীয়তাবাদ। জাতীয়তাবাদ একটি প্রবল মনোভাব, ধর্মীয় চেতনাও প্রবল মনোভাব। এই দুই মনোভাবের সঙ্গেই জড়িয়ে আছে একটি তীব্র প্যাশন। এবং সেই প্যাশন জাতীয়তাবাদকে একটা জঙ্গী চেহারা দিয়েছে আর ধর্মকে দিয়েছে মৌলবাদী লেবাস।

এই মনোভাব উদারনীতি এবং গণতান্ত্রিক সহনশীলতাকে বিনষ্ট করেছে। এর ফলে কেবল দুটি প্রতিদ্বন্দ্বী দেশ অথবা জাতির মধ্যে নয়, একই দেশের এবং একই সমাজের মধ্যেও বিরোধিতা দেখা দিয়েছে। যোগাযোগ ব্যবস্থার অভূতপূর্ব উন্নতির ফলে যে-বিশ্ব এখন একেবারে ছোটো হয়ে এসেছে, যে-বিশ্বের মানুষ এখন মোকাবেলার বদলে ক্রমবর্ধমান সহযোগিতার ওপর নির্ভরশীল, সেই বিশ্বের সঙ্গে এই জঙ্গী জাতীয়তার কোনো সঙ্গতি নেই। বর্তমান কালে খুব কম দেশই আছে যে-দেশের সমাজ বহু-বাচনিক নয়। পুরো দেশ এক ধর্মের, এক মতের অনুসারী, এটা এখন কল্পনা করা শক্ত। সুতরাং সেই বহু-বাচনিক সমাজে অথবা দেশে জঙ্গী জাতীয়তাবাদ অনিবার্যভাবে হানাহানির জন্ম দিয়েছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ নাইজেরিয়া অথবা সুদানের দিকে তাকালে দেখতে পাবো, সে দেশে ধর্মনিরপেক্ষ আইন থাকবে, নাকি ইসলামী আইন থাকবে, তা নিয়ে রীতিমতো দাঙ্গা হয়েছে। চুরি করলে হাত কেটে ফেলা হবে, এ রকমের আইন আধুনিক বিশ্বের উপযোগী কিনা, অথবা চোরের হাত কেটে ফেললে স্থায়ীভাবে সেই চোর এবং সমাজের সমস্যার সমাধান না-হয়ে একটা স্থায়ী সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে কিনা, সে বিতর্কে না-গিয়েও এ কথা অবশ্যই বলা যায় যে, দেশে একাধিক ধর্মীয় সম্প্রদায় থাকলে, সে দেশে কোনো একটা ধর্মীয় আইন চালু করা সঙ্গত নয় অথবা বাঞ্ছিতও নয়। উদারনীতি অথবা গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ দিয়ে সেটা সমর্থন করা যায় না। এবং যায় না বলেই সুদানে এবং নাইজেরিয়ায়, বিশেষ করে নাইজেরিয়ায় ব্যাপক দাঙ্গায় বহু লোক নিহত হয়েছে এবং হবে।

জঙ্গী জাতীয়তাবাদের বিকাশের ফলে আরও একটা প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে, যাকে বলা যায়, ধর্মের মৌলবাদী ব্যাখ্যা এবং অনুসরণ। গোড়াতে ধর্মের যে-আদর্শ ছিলো, অথবা ধর্মগ্রন্থে যে-সব বিধান লেখা আছে, সেখানে ফিরে যাওয়ার সক্রিয় আদর্শকে বলে মৌলবাদ। মৌলবাদ পৃথিবীর হালতম হুজুগে পরিণত হয়েছে। বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তিতে সবচেয়ে উন্নত এবং সবচেয়ে ধনী দেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে শুরু করে বিজ্ঞান থেকে মুখ-ফিরিয়ে-রাখা গরিব দেশ আফগানিস্তান পর্যন্ত পৃথিবীর বহু দেশেই মৌলবাদের জোয়ার এসেছে। দরিদ্র, বঞ্চিত অথবা নির্যাতিত দেশে জাতীয়তাবাদী মনোভাব থেকে ধর্মীয় মৌলবাদ উৎসাহিত হতে পারে; কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রক্ষণশীলতার যে-জোয়ার দেখা দিয়েছে, দেশের প্রেসিডেন্ট থেকে শুরু করে খামারের মালিক পর্যন্ত সাধারণ মানুষ যেভাবে ঈশ্বর নয়, বরং ঈশ্বরের পুত্রকে নিয়ে মেতে উঠেছেন, তা দেখলে আন্তরিকভাবে বিস্মিত না-হয়ে পারা যায় না। এই জনগোষ্ঠী অত্যাধুনিক প্রযুক্তি এবং অন্ধবিশ্বাসের মধ্যে যেভাবে আপোশ করতে পেরেছে, তাও একান্ত বিস্ময়ের ব্যাপার। যদিও এ কথা ঠিক যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকেই মৌলবাদ দানা বাঁধতে আরম্ভ করে। বছরে বছরে নায়াগ্রা সম্মেলনে মৌলবাদী মনোভাব জোরালো হয় এবং প্রথম মহাযুদ্ধের ঠিক পরে ১৯১৯ সালের মহাসম্মেলনে মৌলবাদ মার্কিন সমাজের পাকাপোক্ত ভিত্তির ওপর স্থাপিত হয়।[৪] কিন্তু তারপর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নতি এবং উদারচিন্তারও বিকাশ কম হয়নি। যা নতুন বলে মনে হচ্ছে, তা হলো যে-মৌলবাদ এক সময়ে কতোগুলো ধর্মীয় গোষ্ঠীর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিলো, তা এখন বৃহত্তর সমাজে ছড়িয়ে পড়ছে এবং অন্যদের প্রতি অসহিষ্ণুতা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। খৃস্টানদের মধ্যে নতুন নতুন সম্প্রদায় যেভাবে তৈরি হচ্ছে, তাও এই মৌলবাদী মনোভাব থেকেই। সংস্কার ও অগ্রগতির দিকে না-গিয়ে খৃস্টানরা এখন প্রতিযোগিতায় নেমেছে, কে কতোটা মূল এবং অতীতের পথে ফিরে যেতে পারে। নয়তো, প্রাণরক্ষার খাতিরেও অন্যের রক্ত দিয়ে চিকিৎসা করায় কারো আপত্তি থাকা উচিত নয়। অথবা আপত্তি থাকা উচিত নয় পরিবার পরিকল্পনার সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন ব্যবস্থা মেনে নিতে।

খৃস্টীয় মৌলবাদের পাশাপাশি অন্যান্য ধর্মীয় মৌলবাদও এখন মড়কের মতো বিশ্বকে গ্রাস করছে। এখন আর মার্কিন মুলুকে সীমাবদ্ধ নয়, মৌলবাদ এশিয়ার পূর্ব উপকূল থেকে আফ্রিকা এবং ইউরোপের পশ্চিম উপকূল পর্যন্ত বিশাল ভূ-ভাগে ছড়িয়ে পড়ছে। ইসলামী মৌলবাদ, ইহুদী মৌলবাদ, এমন কি যা অবিশ্বাস্য এবং তত্ত্বত অসম্ভব – হিন্দু মৌলবাদ তীব্র হয়ে দেখা দিয়েছে। এই মৌলবাদের কতোটা ধর্মীয় মৌলবাদ, কতোটা জঙ্গী জাতীয়তাবাদ, তা অবশ্য সঠিকভাবে বলা শক্ত। কিন্তু এর মূলে যাই থাক না কেন, এরা অনেক ক্ষেত্রে একে অন্যের এলাকায় উপচে পড়ছে। ইন্দোনেশিয়ায় সংখ্যালঘু চীনাদের ওপর মুসলমানদের সাম্প্রতিক নির্যাতন হিংস্রতা এবং নির্মমতার দিকে দিয়ে রীতিমতো দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে।[৫] পূর্ব তিমুরে তাদের শিকারে পরিণত হয় সংখ্যালঘু অসংখ্য খৃস্টান। মধ্যপ্রাচ্যের দিকে তাকালেই আমাদের বক্তব্য বোঝা যাবে। বিশেষ করে ইহুদীদের সঙ্গে মুসলমানদের বিরোধ মৌলবাদ এবং কট্টর জাতীয়তাবাদকে একাকার করে ফেলেছে। ইহুদীরা একাধারে উচ্চশিক্ষিত, অত্যাধুনিক প্রযুক্তির অধিকারী এবং অন্ধবিশ্বাসে জর্জরিত। সে দেশের রাজনীতি এবং সমাজ যেভাবে ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান দিয়ে নিয়ন্ত্রিত, তার তুলনা কমই মেলে। তদুপরি, প্রতিবেশী মুসলিম দেশগুলোর প্রতি তাদের মনোভাব অসম্ভব যুদ্ধংদেহী। মাত্র ষাট বছর আগেই ধর্মীয় বিশ্বাস এবং নৃতাত্ত্বিক পরিচয়ের জন্যে লাখ লাখ ইহুদী নাৎসিদের শিকারে পরিণত হয়েছিলো। সংখ্যালঘু হিশেবে পীড়িত হলে সে যন্ত্রণা কিভাবে দগ্ধ করে, সে সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থাকা সত্ত্বেও সেই ইহুদীরাই এখন রাষ্ট্রযন্ত্র দিয়ে ভয়ানক সন্ত্রাসী হামলা চালিয়ে গৃহহীন অত্যন্ত দরিদ্র ফিলিস্তিনীদের নির্মম হাতে নিপীড়ন করতে একটুও দ্বিধাবোধ করছে না। বরং এই সন্ত্রাসী তৎপরতায় তারা অনুপ্রেরণা জোগাচ্ছে তাদের ধর্ম থেকে।

ইহুদীদের হাতে যারা নির্যাতিত, সেই মুসলমানরা প্রযুক্তিতে ইহুদীদের মতো অগ্রসর নয়, ঠিকই। কিন্তু তাই বলে ইসলামী মৌলবাদ ইহুদী মৌলবাদের চেয়ে দুর্বল নয়। বরং, সম্ভবত, তার চেয়েও বেশি জঙ্গী। তা না-হলে নিজেদের জীবনের প্রতি সামান্যতম শ্রদ্ধা এবং মূল্য না-দেখিয়ে, শত শত মুসলিম তরুণ সম্প্রতি অন্যদের জীবননাশের যে-ধ্বংস লীলায় মত্ত হয়েছে, তা হতে পারতো না। আত্মঘাতী বোমা-হামলাকারী তার বন্ধুদের নির্দেশ দিয়ে যেতে পারতো না যে, তারা যেন তিন দিন পরে তার বাড়িতে গিয়ে ফুর্তি করে এবং সেই সঙ্গে মিষ্টি খেয়ে আসে, কারণ সেদিন বেহেস্তে তার বিয়ে হবে। মৌলবাদে বিশ্বাস আছে বলেই ফিলিস্তিনী মা চুমু খেয়ে হাসিমুখে তাঁর একুশ বছর বয়সী আত্মঘাতী বোমা-হমলাকারী পুত্রকে চিরবিদায় দিতে পারেন এবং পুত্রও হাসিমুখে মাকে চুমু খেয়ে চিরবিদায় নিতে পারে। ১৬ জুন (২০০২) তারিখে মাতাপুত্রের এই বিদায়ের যে-দৃশ্যটি ভিডিওতে ধরা পড়েছে, তা থেকে দেখা যায়, মা অথবা ছেলের মুখের একটি পেশীও আসন্ন চরম ঘটনার কথা ভেবে কুঞ্চিত হয়নি। মৌলবাদে অন্ধ বিশ্বাসের জন্যেই এই বিদায়ের অল্প পরে নাঈমা যখন খবর পান যে, তাঁর পুত্র মাহমুদ আত্মঘাতী হামলায় নিহত হয়েছে, তখন তিনি বলতে পারলেন যে, সেটি তাঁর জীবনের সবচেয়ে আনন্দের দিন। তাঁর পাড়াপ্রতিবেশীরা তাঁর পুত্রকে শহীদ এবং তাঁকে শহীদ-জননী বলে গৌরবান্বিত করতে পারলেন। এই একই চেতনা থেকে ফিলিস্তিনী পিতামাতা শিশুপুত্রকে আত্মঘাতী বোমা-হামলাকারীর সাজে সজ্জিত করে তার ছবি তুলতে পারেন। বলা বাহুল্য, ফিলিস্তিনে ইসরাইল যে-নির্মম এবং নজিরহীন রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস চালাচ্ছে এবং অর্ধ শতাব্দীরও বেশি সময় ধরে ফিলিস্তিনীরা যে-দারিদ্র্য, নিপীড়ন এবং হতাশার মধ্যে কোনোক্রমে বেঁচে আছেন, তার ফলে জঙ্গী জাতীয়তাবাদের উত্থান হতেই পারে। এবং সেই জাতীয়তাবাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে মানুষ আত্মবিসর্জনেও এগিয়ে যেতে পারে। কিন্তু সেই আত্মবিসর্জনে সত্যিকার সাহস এবং ইন্ধন জোগাচ্ছে ধর্মীয় মৌলবাদ। পরকালের অনন্ত সুখের আশ্বাস পাওয়া যাচ্ছে বলেই এই তরুণ-তরুণীরা তাঁদের সমস্ত জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা বিসর্জন দিয়ে নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারছে।

আসলে এখানে উগ্র জাতীয়তাবাদ এবং ধর্মীয় মৌলবাদ একাকার হয়ে গেছে। একে অন্যের পরিপূরক হিশেবে কাজ করছে। আল-কাইদার সামরিক প্রশিক্ষণের একটি ভিডিও দেখেছিলাম, যাতে ফৌজী উর্দি-পরা তরুণদের এক হাতে কালাশনিকফ রাইফেল অন্য হাতে কোরান নিয়ে মার্চ করার ছবি ছিলো। যে-ইসলাম ধর্মে সাম্য এবং মৈত্রীর আদর্শের প্রতি এতো শ্রদ্ধা দেখানো হয়েছে, যে-ধর্মে জোর-জবরদস্তি নেই বলে ঘোষণা করা হয়েছে, যে-ধর্মে বলা হয়েছে "তোমার ধর্ম তোমার, আমার ধর্ম আমার", যে-ধর্মের নামই শান্তির ধর্ম, আমার বিবেচনায় এই মার্চের দৃশ্য সেই ধর্মের সত্যিকার অবমাননা।

এমন কি, যে-হিন্দু ধর্মের কোনো বিশেষ ধর্মগ্রন্থ নেই, কোনো বিশেষ প্রবর্তক নেই, যে-হিন্দু ধর্ম শত শত বছর ধরে

শক-হুন দল, মোগল-পাঠানকে নিজের ছত্রচ্ছায়ায় নিয়ে আসতে, সমন্বিত হতে দ্বিধা করেনি, সেই হিন্দু ধর্মের অনুসারীরা পর্যন্ত মৌলবাদী অথবা, নিদেন পক্ষে, ধর্মীয় জঙ্গীবাদে বিশ্বাসী হয়ে উঠেছে। যে-ভারত গোড়া থেকে একটা ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিশেবে নিজের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করেছিলো, সেই ভারত এখন অন্য মানুষের অধিকারের প্রতি কদলী দেখিয়ে কট্টর ধর্মীয় জাতীয়তাবাদের গৈরিক পতাকা উড়িয়ে দিয়েছে। শিবসেনা, আরএসএস এবং বিশ্বহিন্দু পরিষদের সহায়তায় ডানপন্থী বিজেপি এখন বিশ্বের সবচেয়ে বড়ো গণতান্ত্রিক দেশের ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত। ভারতে এই ধর্মীয় জাতীয়তাবাদের বিজয় পড়শি দেশগুলোর ধর্মীয় জাতীয়তাবাদের প্রতিক্রিয়ার ফসল কিনা, তা নিয়ে পণ্ডিতরা বিতর্ক করতে পারেন। কিন্তু এ যে ভারতের বহু শতাব্দীর উদারপন্থার পরাজয়, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহের কারণ নেই।

উত্তর আয়ারল্যান্ডে দেখতে পাই বছরের পর বছর ধরে চলছে অতি-রক্ষণশীল ক্যাথলিক খৃস্টানদের সঙ্গে তুলনামূলকভাবে প্রগতিশীল খৃস্টানদের হানাহানি। ক্যাথলিক এবং প্রোটেস্ট্যান্টদের এ রকমের হানাহানির দৃষ্টান্ত কেবল উত্তর আয়ারল্যান্ডই প্রথম স্থাপন করলো, তা নয়। সপ্তদশ শতকের প্রথম ভাগে ক্যাথলিকদের সঙ্গে প্রোটেস্ট্যান্টদের যে-যুদ্ধ শুরু হয়, তা জার্মেনি এবং অস্ট্রিয়া-সহ বিরাট এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে। তিন দশক ধরে সে যুদ্ধ চলে এবং বলা হয় যে, তাতে এক কোটিরও বেশি লোক নিহত হয়েছিলো। কিন্তু তার পর তিন শো বছর চলে গেছে এবং জ্ঞানে-বিজ্ঞানে পৃথিবী এখন অনেক দূর এগিয়ে গেছে। তা সত্ত্বেও, বিংশ শতাব্দীর শেষে এবং একবিংশ শতাব্দীর গোড়াতে উত্তর আয়ারল্যান্ডে যে-হানাহানি চলছে, তা কেবল রাজনীতি অথবা জাতীয়তাবাদের কারণে নয়। ধর্মান্ধতাও অনেকটাই জড়িয়ে আছে তার সঙ্গে। বস্তুত, ধর্মান্ধতা এমন আষ্ঠেপৃষ্ঠে এই দেশের দুই সম্প্রদায়কে আচ্ছন্ন করেছে যে, এই দেশের এক সম্প্রদায়ের তরুণের সঙ্গে অন্য সম্প্রদায়ের তরুণীর প্রেম এবং বিবাহকে পর্যন্ত এই দেশের মৌলবাদী নাগরিকরা মেনে নিতে পারছে না। এ রকমের একাধিক তরুণ-তরুণীকে খুন করে তারা নিজেদের "ধর্মীয় দায়িত্ব" পালন করেছে। বলা বাহুল্য, একমাত্র ধর্মান্ধতাই এমন বর্বরোচিত কাজে মানুষকে উৎসাহিত করতে পারে। পিতার বন্ধুর হাতে ধর্ষিত হওয়া একটি ষোলো-সতেরো বছর বয়সী মেয়ে যখন সে দেশে গর্ভপাত করতে চায়, তখনও তার অনুমতি মেলে না। স্বাস্থ্যগত কারণে গর্ভপাতও সেখানে বেআইনী। অনিবার্য কারণে গর্ভপাত করা যাবে কিনা, তা নিয়ে সে দেশে যখন গণভোট অনুষ্ঠিত হয়, তখনো সেদেশের বেশির ভাগ লোক গর্ভপাতের বিরুদ্ধে রায় দেয়। ২০০২ সালের ঈস্টার উপলক্ষে লন্ডনের অদূরে রেডিং শহরে একটি ধর্মপ্রচারক গোষ্ঠী একটি লোককে নেংটি পরিয়ে দিয়ে ক্রুশে তুলে যিশু খৃস্টের রক্তাক্ত সমাপ্তির পুনরভিনয় করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সাম্প্রতিক কালে বহু খৃস্টান প্রচারক প্রকাশ্য সভায় যিশু খৃস্টের নামে দুরারোগ্য রোগ ভালো করে দেওয়ার অভিনয় করেছে এবং করে চলছে। ধর্মের নাম ভাঙিয়ে যারা লাভবান হতে চায়, তাদের পক্ষে একটা অসম্ভব নয়। এবং এটা দেখে একবিংশ শতাব্দীতে অবাক না-হয়ে পারা যায় না। কিন্তু যারা সত্যি সত্যি এই বুজরুকিতে বিশ্বাস করে, তাদের দেখে আরও বেশি বিস্মিত হতে হয়। ভারতে সাধু-সন্ততে এবং বাংলাদেশে পীরদের প্রতি ইদানীং যেভাবে সাধারণ মানুষের বিশ্বাস বাড়ছে, তাতেও বিস্মিত না-হয়ে পারা যায় না। শিক্ষিত লোকেরা সাম্প্রতিক কালে এক-একজন সাধুর প্রতি যে-রকমের বিশ্বাস স্থাপন করার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন, তেমন আন্তরিক বিশ্বাস স্বয়ং ঈশ্বরের ওপর স্থাপন করতে পারলে বহু আগেই হয়তো তাঁদের স্বর্গপ্রাপ্তি হতো। এবং এই অন্ধবিশ্বাস কেবল পূর্ব দেশে সীমাবদ্ধ নেই। সুদূর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ভারত থেকে যাওয়া রাজনীশের মতো সাধুরা গিয়ে আত্মপরিচয়ের সংকটে কাতর শিক্ষিত লোকেদের রহস্যময় ধর্মে অথবা বিভিন্ন যৌনাচার সংবলিত ধর্মে দীক্ষা দিয়ে বহু অহিন্দুকে দিয়ে যেসব অদ্ভুত এবং অবিশ্বাস্য কাজ করাচ্ছে, তা না-দেখলে বিশ্বাস করা কঠিন হয়।

সম্প্রতি বাংলাদেশে একজন ধর্মান্ধ পিতা এ রকমের একটি অবিশ্বাস্য দৃষ্টান্ত সৃষ্টি করেছে। সে কোরবানি উপলক্ষে গোরু অথবা ছাগল কোরবানির প্রচলিত রীতিতে সন্তুষ্ট থাকতে পারেনি, বরং ভক্তি এবং আত্মত্যাগের মডেল তৈরি করার উদ্দেশে সে নাকি তার শিশু-পুত্রের গলা কেটে কোরবানি দিয়েছে। ধর্মের নামে এই বর্বরতা হঠাৎ একদিনে আসেনি। আমার ধারণা, গত তিন দশক ধরে সৌদী আরব এবং মধ্যপ্রাচ্যের অন্য কোনো কোনো দেশের পেট্রো-ডলারের সহায়তায় বাংলাদেশ-সহ এশিয়া এবং আফ্রিকার বহু দেশেই ধর্ম প্রচার তথা তবলীগের যে-কাজ চলছে, অংশত তা ধর্মের প্রতি চূড়ান্ত আনুগত্য এবং সেই সঙ্গে ধর্মের নামে অযৌক্তিক সংস্কারে বিশ্বাস বদ্ধমূল করেছে। এ ছাড়া, সারা পৃথিবীতে গত কয়েক দশক ধরে যে-ধর্মীয় জাতীয়তার উত্থান লক্ষ্য করি, তাও হয়তো এ রকমের উন্মত্ততা উস্কে দিয়েছে। কিন্তু উন্মত্ততা যতোই বৃদ্ধি পাক, এ কথা না-বলে উপায় নেই যে, এ হলো গোটা মানব

সংসারকে বহু শতাব্দী পেছনে নিয়ে যাওয়ার অবাস্তব এবং দুর্ভাগ্যজনক প্রয়াস।

১৯৭১ সালে বাংলাদেশকে স্বাধীন করার জন্যে হিন্দু-মুসলমান, বৌদ্ধ-খৃস্টান সবাই একযোগে কাজ করেছিলেন। সত্যি বলতে কি, ত্যাগ স্বীকার এবং ক্ষতির কথা বললে হিন্দুদেরই তখন বেশি মূল্য দিতে হয়েছিলো। কিন্তু এখন সেই হিন্দুরা বাংলাদেশে কার্যত দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকে পরিণত হয়েছেন। ৭১ সালে হিন্দু-সহ অগণিত মানুষ প্রাণ দিয়েছিলেন এক ধর্মনিরপেক্ষ বাংলাদেশ গড়ে তোলার জন্যে, এখন সংবিধান অনুযায়ী সে দেশের রাষ্ট্রীয় ধর্ম হলো ইসলাম। কোনো ধার্মিক ব্যক্তি সংবিধানের এই সংশোধন করেননি, এই সংশোধন করেছিলেন এমন একজন ফৌজী একনায়ক নারী এবং কারণবারিতে যাঁর উদারতা এবং আসক্তি প্রায় কিংবদন্তীতে পরিণত হয়েছে। সুতরাং, ধরে নিচ্ছি, পুণ্য অর্জনের মহৎ সংকল্প থেকে তিনি সংবিধানের এই পরিবর্তন আনেননি। এনেছিলেন নিজের গদি পাকা করার জন্যে। এই পরিবর্তন পাকা হবারও আগে যিনি এই পরিবর্তনের ভিত্তি তৈরি করেছিলেন, তিনি বাংলাদেশ স্বাধীন করার জন্যে রীতিমতো যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন এবং বীর-উত্তম বলে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। কিন্তু তিনিও ধর্মের প্রেমে মাশুক হয়ে বাংলাদেশের ধর্মনিরপেক্ষ সংবিধান পরিবর্তন করেননি, অথবা বাঙালিদের বাংলাদেশীতে পরিণত করেননি, তিনিও করেছিলেন স্রেফ ক্ষমতা কুক্ষিগত করার উদ্দেশ্য নিয়ে। সত্যি বলতে কি, উপহাদেশে এবং বহির্বিশ্বে ধর্মের নাম ভাঙানো রাজনীতির এখন জয়জয়াকার। এই রাজনীতিই আবার ধর্মকে মৌলবাদী হতে সাহায্য করছে।

মৌলবাদের একটা বড়ো লক্ষণ নারীপ্রগতির বিরোধিতা করা। নারীদের ঘরের মধ্যে বন্দী করে রাখা, উচ্চশিক্ষা না-দেওয়া, চাকরি করতে বাধা দেওয়া, এমন কি, তাদের রক্ষণশীল পোশাক-আশাক পরতে উৎসাহিত করা মৌলবাদী মানসিকতারই প্রমাণ দেয়। এ সংজ্ঞা অনুসারেও বাংলাদেশ মৌলবাদের পথে যাচ্ছে। সাম্প্রতিক কালে বাংলাদেশে দু-দজন মহিলা প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হলেও, নারীদের ওপর নির্যাতনের বহু নজির সৃষ্টি হয়েছে। বিশেষ করে ফতোয়া দিয়ে নারী নির্যাতনের যে-দৃষ্টান্ত দেখা যাচ্ছে, তা নিঃসন্দেহে মৌলবাদ প্রসারেরই লক্ষণ। গত এক দশকের মধ্যে বাংলাদেশে একাধিক নারীকে অংশত মাটির মধ্যে পুতে তাদের গায়ে ইঁট-পাটকেল ছুঁড়ে হত্যা করার অথবা শাস্তি দেওয়ার যে-ঘটনা ঘটেছে, তার অনুরূপ ঘটনা পাকিস্তানী আমলেও কোনো দিন ঘটেনি। এখন বিশ্ববিদ্যালয়ে যতো বোরকা-পরা অথবা মাথায় ঘোমটা-পরা ছাত্রী দেখা যায়, পাকিস্তানী আমলে তার এক ভাগও দেখা যায়নি। সত্যি বলতে কি, কেবল বাংলাদেশে নয়, গোটা মুসলিম-বিশ্বে নারীদের পিছিয়ে দেওয়ার প্রক্রিয়া লক্ষ্য করা যাচ্ছে এবং এটা নিঃসন্দেহে মৌলবাদের স্রোতে উজান পথে যাওয়ার অভ্রান্ত উদাহরণ।

অথচ স্ববিরোধ মৌলবাদের ভেতরেই নিহিত আছে। একদিকে বিশ্ব যখন বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তির পথ ধরে আধুনিকতার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, তখন মৌলবাদ মানুষকে পেছনের দিকে টানছে। এ হচ্ছে সময়ের অগ্রগতিকে অস্বীকার করার অথবা সামাজিক মূল্যবোধ এবং পরিবর্তনশীল বিশ্বের বিরুদ্ধে যাওয়ার অসম্ভব প্রয়াস। দৃষ্টান্ত স্বরূপ ইসলামী মৌলবাদের কথা বলা যায়। ইসলাম ধর্ম প্রচারিত হয়েছিলো দেড় হাজার বছর আগে। প্রধান ধর্মগুলির মধ্যে ইসলাম ধর্ম সবচেয়ে সাম্প্রতিক এবং তার বিধি-বিধান সুলিখিত। ওয়েল ডকুমেন্টেড বলে সময়ের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সংস্কারের পথে অগ্রসর হতে সে না-রাজ। সংস্কারের কথা বলায়, অথবা কিঞ্চিৎ ভিন্ন পথে চলায়, বহু শতাব্দী আগে মোতাজিলাদের নির্মম শাস্তি পেতে হয়েছিলো। সুফীদেরও ভালো চোখে দেখা হয়নি। সত্যি বলতে কি, মুসলমানরা ধর্ম নিয়ে বিতর্কও পছন্দ করেননি। আধুনিক কালে এসে পশ্চিমা চাপের মুখে মুসলমানরাও হয় পশ্চিমা প্রভাবকে স্বীকার করে নিতে পারতেন। নয়তো তাঁরা ইসলাম প্রাচীরগুলোকে শক্ত করে নিজেদের পশ্চিমা প্রভাবের হাত থেকে আড়াল করে রাখতে পারতেন। এই দ্বিতীয় পন্থাকেই অনেকে শ্রেয় বলে বিবেচনা করে ধর্মের মূলে ফিরে যাওয়ার মৌলবাদী আন্দোলন শুরু করেছেন।

এখানেই উপ্ত রয়েছে স্ববিরোধের বীজ। কারণ, ধর্মকে অনুসরণের যেসব বিধিব্যবস্থা ধর্মগ্রন্থে আছে, তা অবিকতভাবে পালন করা এই পরিবর্তিত পৃথিবীতে সম্ভব কিনা, তাই অনেকে প্রশ্ন করতে পারেন। ব্যবহারিক এবং রাষ্ট্রীয় জীবনে পারিপার্শ্বিক পৃথিবীকে অথবা অত্যাধুনিক প্রযুক্তিকে অস্বীকার করার উপায় নেই। আন্তর্জাতিক আইনের সঙ্গে ইসলামী আইনের অথবা আদর্শের অনেক ক্ষেত্রেই সামঞ্জস্য নেই। তাই ইসলামী দেশগুলিকে তা স্বীকার করে নিতে হয়। ইসলামী আইন অনুসারে সুদ অগ্রহণযোগ্য। কিন্তু ইসলামী দেশগুলোও সুদ-ভিত্তিক বিশ্বের তাবৎ ব্যাংকের সঙ্গে কাজ-কারবার করছে। করতে বাধ্য হচ্ছে। ইউরোপীয় দেশগুলোতে বহুবিবাহ নিষিদ্ধ। সেখানে যে-মুসলমানরা বাস করে, তারা ইচ্ছে করলেও কোরানের দোহাই দিয়ে একাধিক বিয়ে করতে পারে না। দাসত্ব প্রথা আন্তর্জাতিক

আইন অনুসারেই নিষিদ্ধ। ধনী মুসলমানরা ইচ্ছে করলেও তাদের দেশে কি বিদেশে দাস অথবা দাসী রাখতে পারে না। এমন কি, ইসলামী মৌলবাদকে বাস্তবায়িত করার জন্যে যারা সক্রিয়, তারাও বিজ্ঞান, প্রযুক্তি এবং সমাজের কোনো কোনো আধুনিক চিন্তা এবং আন্তর্জাতিক আইন অস্বীকার করতে পারছে না। বরং ধর্ম পালনের সঙ্গে জড়িত বহু জিনিশই, যেমন ধরা যাক, মাইক্রোফোন, আধুনিক বিজ্ঞানেরই আবিষ্কার। তাও তাদের মেনে নিচ্ছে হচ্ছে। কেবল ধর্ম পালনের জন্যে নয়, জঙ্গী জাতীয়তাবাদকে বাস্তবায়িত করার জন্যে তারা যেসব মারণাস্ত্র ব্যবহার করছে, তাও আধুনিক প্রযুক্তিরই ফসল। রোগে এবং ভোগে তারা যেসব উপাদান ব্যবহার করছে, সেসব তৈরি হয়েছে আধুনিক বিজ্ঞান দিয়ে। কিন্তু মৌলবাদীরা এসব সত্ত্বেও সংস্কারবাদীদের সবচেয়ে বড়ো শত্রু হিশেবে বিবেচনা করে। কূপমণ্ডুকের মতো তারা যে কেবল নিজেদের একটা সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ রাখতে চায়, তাই নয়, তারা অন্যদেরও রুদ্ধদ্বার ঘরের মধ্যে বন্দী রাখতে চায়।

সংস্কারের প্রসঙ্গে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কথা মনে পড়া অস্বাভাবিক নয়। রামমোহন রায় যে-মননশীল একশ্বেরবাদ প্রচার করেছিলেন জীবনের একটি পালনীয় আদর্শ হিশেবে, আচার-অনুষ্ঠান-পার্বণ যুক্ত করে দেবেন্দ্রনাথ তাকেই একটি প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের চেহারা দিতে চেয়েছিলেন। এমন কি, অনুসারীদের তিনি একটি ধর্মগ্রন্থও উপহার দিয়েছিলেন। সেই ধর্মগ্রন্থের ভিত্তি হিশেবে তিনি ব্যবহার করেছিলেন বেদ এবং উপনিষদকে। কিন্তু বেদের সবকিছু অভ্রান্ত কিনা, সে সম্পর্কে তিনি নিশ্চিত ছিলেন না। সে জন্যে চারজন পণ্ডিতকে তিনি কাশীতে পাঠিয়েছিলেন বেদ অধ্যয়ন করে তার অভ্রান্ততা সম্পর্কে তাঁকে পরামর্শ দেওয়ার জন্যে। এই পণ্ডিতরা যখন জানালেন যে, বেদ অভ্রান্ত নয়, তখন দেবেন্দ্রনাথ বেদ এবং উপনিষদের সেই সব শে-াকই তাঁর সংকলিত ব্রাহ্মধর্ম গ্রন্থে গ্রহণ করেন, যেগুলিকে তাঁর কাছে অভ্রান্ত মনে হয়েছিলো। এমন কি, তিনি কোথাও কোথাও নিজে সেই শে-াকে পরিবর্তনও করেন। মার্টিন লুথার মনে করেছিলেন যে, ল্যাটিনের দুর্বোধ্য রহস্য থেকে ধর্মকে মুক্তি দিতে পারলে লোকেরা ধর্মকে নিজের করে নিতে পারবে। তিনি তাই বাইবেলের অনুবাদ করেছিলেন দেশীয় ভাষায়। অপর পক্ষে, পোপের মনে হয়েছিলো, লুথারের এই অপপ্রয়াসের ফলে চার্চের প্রতি মানুষের অন্ধ আনুগত্য হ্রাস পাবে। তিনি তাই লুথারকে খৃস্টীয় চার্চ থেকে বহিষ্কার করেছিলেন। লুথার অথবা দেবেন্দ্রনাথের সংস্কারের আদর্শ সবার কাছে পালনীয় দৃষ্টান্ত মনে না-ও হতে পারে। কিন্তু সময়ের অগ্রগতির সঙ্গে এগিয়ে যেতে না-পারলে, উন্নতির পথে প্রতিবন্ধক দেখা দেওয়া যেমন স্বাভাবিক, তেমনি সম্ভব স্ববিরোধের শিকার হওয়া।

অনেকগুলি ইসলামী দেশ প্রচুর অর্থ থাকা সত্ত্বেও এখনো উন্নত দেশগুলোর তুলনায় জ্ঞানে-বিজ্ঞানে পিছিয়ে রয়েছে। ব্যক্তি এবং রাষ্ট্রীয় জীবনে তাদের বারবার হাত পাততে হয় পাশ্চাত্যের কাছে। এর সবচেয়ে বড়ো কারণ শিক্ষায় তাদের অনগ্রসরতা। কিন্তু এ শুধু শিক্ষার অনগ্রসরতার ফল নয়, এর পেছনে রয়েছে একটি আপোশহীন পশ্চাদমুখী মনোভাব। যে-মনোভাব জীবন এবং দৃষ্টিভঙ্গিকে সামনে এগিয়ে যেতে দেয় না।

বস্তুত, কেবল ইসলামী মৌলবাদ নয়, তাবৎ মৌলবাদের চেহারাই কমবেশি এক। মৌলবাদ মাত্রই আপোশহীন, অসহিষ্ণু এবং ধর্মের মূল স্পিরিটের বিরোধী। যে-ধর্ম গোড়াতে নিজেকে এবং অন্যকে ভালোবাসতে শিখিয়েছে, সেই ধর্মই এখন অন্যকে হত্যা করার প্রেরণা জোগাচ্ছে। যে-ধর্ম গোড়াতে নিজেকে এবং বিশ্বকে জানার জন্যে উৎসাহ দিয়েছে, এখন ধর্মগ্রন্থের দোহাই দিয়ে সেই ধর্মই মুক্তদৃষ্টি এবং মুক্তবুদ্ধির ওপর কালো ঘেরাটোপ দিয়ে অজ্ঞানতা এবং অন্ধবিশ্বাসকে মজবুত করার নির্দেশ দিচ্ছে। জড় বিধানের দোহাই দিয়ে ধর্ম এখন ব্যাহত করছে মানুষের আত্মজিজ্ঞাসা এবং আধ্যাত্মিকতার বিকাশ। বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসা এবং মননশীল বিতর্ককেও সে বাধা দিচ্ছে। সৎ এবং শুভ ধর্মচর্চার মাধ্যমে সমাজ যে-প্রগতির পথে এগিয়ে যেতে পারতো, মৌলবাদ সেই প্রশস্ত এবং কল্যাণের পথকে এখন রুদ্ধ করেছে। জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং মুক্তবুদ্ধির চর্চার মাধ্যমে সভ্যতাকে এগিয়ে নেওয়ার উদ্দেশ্যে তাই মৌলবাদকে রুখে দাঁড়ানো দরকার।

জাতীয়তাবাদ, সাম্রাজ্যবাদ এবং মার্কসবাদ

আধ্যাত্মিকতার বাইরেও ধর্মের একটা ভূমিকা আছে। সেই ধর্ম মানুষের প্রাত্যাহিক জীবন, সামাজিক কর্মকাণ্ড, এমন কি, রাষ্ট্রীয় নীতিমালাকেও প্রভাবিত করতে পারে। বিশেষ করে জাতীয়তাবাদকে বিশেষ খাতে পরিচালিত করে উস্কে দিতে দিতে পারে জঙ্গী জাতীয়তাবাদ। বয়সে নবীন হলেও জাতীয়তাবাদ আধুনিক বিশ্বের একটা প্রধান

চালিকা শক্তি এবং এখন সেও একটা ধর্মে পরিণত হয়েছে। বস্তুত, কোনো কোনো ক্ষেত্রে সে ধর্মের চেয়েও প্রবল প্যাশনের রূপ নিয়েছে। যে-অর্থে এখন দেশাত্মবোধ কথাটাকে ব্যবহার করা হয়, তার সঙ্গে জাতীয়তাবাদের তেমন কোনো পার্থক্য নেই। কিন্তু উনিশ শতকের আগে পর্যন্ত দেশের প্রতি মানুষের যা ছিলো, সেটাকে দেশের প্রতি সাধারণ ভালোবাসা ছাড়া অন্য কোনো নামে চিহ্নিত করা যেতো না। অন্তত, তার সঙ্গে আজকের উগ্র এবং প্রবল জাতীয়তাবাদের কোনো তুলনা চলে না। একটা বিশেষ ভাষাভাষী সাংস্কৃতিক, আঞ্চলিক এবং ধর্মীয় অনুষঙ্গের সঙ্গে জড়িয়ে জাতীয়তাবাদের যে-ধারণা গড়ে উঠেছে, তার বয়স দেড় শো দু শো বছরের বেশি নয়। এবং এ প্রক্রিয়া শুরু হয় পশ্চিমা দেশগুলোতে।

এখন জাতীয়তাবাদ বলতে যা বোঝায়, সে ধারণা ভারতীয় সমাজে একেবারে নতুন। সে কারণে, এ ধারণা বোঝানোর মতো কোনো শব্দ ভারতীয় ভাষাসমূহে কোনো কালেই ছিলো না। জাতীয়তাবাদ শব্দটা একটা অনুবাদমূলক শব্দ, আধুনিক আমদানি। বাংলা ভাষায় জাতি বললে প্রধানত ধর্মীয় সম্প্রদায় বোঝাতো। এখনো কেউ কেউ সেই অর্থে জাতি শব্দটা ব্যবহার করে। এমন কি, জাতি বললে বর্ণভেদ অর্থে সামাজিক সম্প্রদায়ও বোঝায়। লিঙ্গভেদ করতেও জাতি শব্দ ব্যবহার করা হয়। বংশ অর্থেও। ১৯৩০-এর দশকে প্রকাশিত হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিধানেও জাতীয়তাবাদ দূরে থাক, জাতীয়তা শব্দও নেই। ১৯১৬ সালে রবীন্দ্রনাথ জাপানের নব্য-জাতীয়তাবাদকে পাশ্চাত্যের অনুকরণ বলে নিন্দা করেন। কিন্তু তাকে জাতীয়তাবাদ নামে আখ্যায়িত করেননি। এর অল্পকাল পরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তিনি যে-সব বক্তৃতা দেন, তার একটির নাম দেন "দ্য কাল্ট অব ন্যাশনালইজম।" কিন্তু তার বহু বছর পরেও তিনি ন্যাশনালইজম শব্দের বাংলা পরিভাষা ব্যবহার করেননি। এমন কি, গত পঞ্চাশ বছরেও এই ধারণা সম্পর্কে যাঁরা লিখেছেন, সেই লেখকদের রচনায় এ শব্দের ব্যবহার নিয়ে কিছু অস্থিরতা দেখতে পাই। প্রথম দিকে জাতীয়তাবাদের বদলে অনেকেই লিখতেন জাতীয়তাবোধ অথবা স্বাজাত্যবোধ।

জাতীয়তাবাদ সবচেয়ে প্রবল হয়ে দেখা দিয়েছিলো ইউরোপের কয়েকটি দেশে। ষোড়শ শতাব্দী থেকে ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, হল্যান্ড, ডেনমার্ক, স্পেন এবং পর্তুগাল অন্যান্য মহাদেশের বিরাট ভূ-ভাগে উপনিবেশ স্থাপন করতে শুরু করে। ইউরোপে জার্মেনি এবং ইটালি এবং এশিয়ায় জাপান যখন বুঝতে পারলো যে, সাম্রাজ্য বিস্তারের এই প্রতিযোগিতায় তারা পিছিয়ে পড়েছে, এবং তাদের তৈরি শিল্পজাত মালামালের জন্যে অনুকূল বাজার অত্যাবশ্যক, তখন তাদের জন্যে বড্ডো দেরি হয়ে গেছে। এই পরিবেশেই তাদের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দেয়। উনিশ শতকের শেষ দিকে এবং বিশ শতকের গোড়ায় এভাবেই ইউরোপীয় জাতীয়তাবাদ আন্তর্জাতিকতা হারিয়ে ফেলে। তার বদলে জাতীয়তাবাদ একটা রক্ষণশীল ও আঞ্চলিক চরিত্র লাভ করে এবং তার পরিণতি লক্ষ্য করি প্রথম মহাযুদ্ধে। নতুন উপনিবেশ গড়ে তোলার মনোভাব থেকেই জাপান কোরিয়াকে গ্রাস করেছিলো। হামলা চালিয়েছিলো চীনের ওপর। ১৯১৬ সালে জাপান-সফরের সময় রবীন্দ্রনাথ এমন কথাও বলেন যে, ভারতের দিকেও জাপানের লুব্ধ দৃষ্টি রয়েছে। রবীন্দ্রনাথ দেখে যেতে পারেননি, কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় জাপান তাঁর এই ভবিষ্যদ্বাণীকে সত্য বলে প্রমাণ করেছিলো। বস্তুত, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রয়োজন হয়েছিলো প্রথম মহাযুদ্ধ দিয়ে উপনিবেশ বিস্তারের বখেড়া মেটানো যায়নি বলে। জাতীয় স্বার্থ রক্ষার প্রশ্ন থেকে বিপ-ব-পরবর্তী রাশিয়ায়ও এই একই ধরনের অসন্তোষ দেখা দিয়েছিলো।

উপনিবেশ গড়ে তোলার প্রতিযোগিতা ছাড়া, ইওহান হের্ডারের মতে, অন্যের শাসনাধীন নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠীও জাতীয়তাবাদী হয়ে উঠতে পারে। বিশেষ করে, নির্যাতিত একটি বিশেষ বর্ণের অথবা সাংস্কৃতিক সম্প্রদায়ের পক্ষে জাতীয়তাবাদী হয়ে ওঠা স্বাভাবিক। এভাবেও জার্মেনি-সহ ইউরোপের কোনো কোনো দেশে জাতীয়তাবাদ দানা বেঁধেছিলো।

প্রথম মহাযুদ্ধের ঠিক আগে রবীন্দ্রনাথ কবি হয়েও, অথবা হয়তো কবি হওয়ার জন্যেই, জাতীয়তাবাদের একদিকে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আগ্রাসী চেহারা, অন্যদিকে দেশের ভেতরে সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে বিভাজনের মনোভাব লক্ষ্য করেছিলেন। সে কারণে সোচ্চার কণ্ঠে তিনি একে নিন্দা জানিয়েছিলেন। তিনি অনুভব করেছিলেন যে, জাতীয়তাবাদের আনুগত্য উদার আন্তর্জাতিকতা অথবা মানবতার কাছে নয়, তার অন্ধ আনুগত্য দেশের কাছে। কিন্তু "মাই কান্ট্রি, রাইট অর রং"– এই আদর্শকে কোনো উদারমনা, যুক্তিবাদী, মানবপ্রেমিকের পক্ষেই মেনে নেওয়া সম্ভব নয়। রবীন্দ্রনাথও মানতে পারেননি।

জাতীয়তাবাদ এমন স্বার্থপরতার জন্ম দেয় যে, তার ফলে একটা আন্তর্জাতিক ধারণাও সংকীর্ণ জাতীয় স্বার্থে পরিণত হতে পারে। এর দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলো রুশ কমিউনিজম। কমিউনিজম সকল রাষ্ট্রীয় সীমান্ত অতিক্রম করে বিশ্বের সকল শ্রমিকদের একত্রিত হওয়ার আহ্বান জানিয়েছিলো। সংজ্ঞা অনুসারেই তার চরিত্র আন্তর্জাতিক। কিন্তু বাস্তবে লক্ষ্য করি প্রথম ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মাঝখানে সেই কমিউনিজম স্তালিন-শাসিত রাশিয়ার জাতীয় স্বার্থ রক্ষার কারণে জাতীয়তাবাদী চরিত্র লাভ করে। তাঁর আমলে তাই কমিউনিস্ট সাম্রাজ্য বিস্তারের প্রক্রিয়া চলতে থাকে। বাইরে তার চেহারা ছিলো কমিউনিজম অথবা সাম্যবাদ বিস্তারের। কিন্তু ভেতরে তা রুশ অর্থনীতির অবকাঠামো, বাজার সম্প্রসার এবং আন্তর্জাতিক প্রভাব বিস্তার ছাড়া তেমন কিছু ছিলো না।

অপর পক্ষে, কমিউনিস্ট সাম্রাজ্য বিস্ফারের দ্রুত প্রক্রিয়া দেখে পশ্চিমা পুঁজিবাদী এবং সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি অনেক ক্ষেত্রে নিজেদের দ্বন্দ্ব ভুলে গিয়ে একযোগে কমিউনিজম সম্প্রসারণ রুখে দাঁড়ায়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এভাবেই বিশ্বের বৃহত্তম মহাসাগর পার হয়ে কোরিয়া এবং ভিয়েতনামে এসে দীর্ঘ রক্তাক্ত যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অবাধ অর্থনীতি এবং ব্যক্তিস্বাধীনতার নামে বছরের পর বছর ভিয়েতনামে গণহত্যা চালিয়েছে। উত্তর এবং দক্ষিণ ভিয়েতনামের প্রতি বর্গ মাইল জায়গার ওপর গড়ে ৭০ টনের বেশি বোমা ফেলেছিলো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। অন্য ভাষায় বললে, মাথাপিছু প্রতিটি লোকের জন্যে ৫০০ পাউন্ড বোমা । এমন কি, গাছপালা ধ্বংসের রাসায়নিকও ছড়িয়ে দিয়েছিলো দেশের অনেক জায়গায়।[৬] বস্তুত, তার অত্যাধুনিক মারণাস্ত্রের হামলা থেকে নিরপরাধ শিশু, বৃদ্ধ অথবা নারী কেউই রক্ষা পায়নি। অসংখ্য নারী মার্কিন সৈন্যদের ধর্ষণের শিকারে পরিণত হয়েছিলো। গেরিলাদের বিরুদ্ধে লড়াই-এর নামে মার্কিন সৈন্যরা যে-অসংখ্য হামলা চালিয়েছিলো, তার বেশির ভাগ হামলার শিকার হয় বেসামরিক লোকেরা। মাই লাই-এর[৭] মতো বর্বর অত্যাচারও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কমিউনিজম-বিরোধী মুক্তবিশ্বের আদর্শ দিয়ে যুক্তিযুক্ত বলে প্রমাণ করতে চেষ্টা করছিলো।[৮] *নিউজউইক* পত্রিকার এক সংবাদদাতা, যিনি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে ইউরোপে কাজ করেছিলেন, তাঁর মতে, নাৎসিরা ইহুদীদের ওপর যে-নির্যাতন চালিয়েছিলো, ভিয়েতনামে মার্কিন নির্যাতন তাকে হার মানিয়েছিলো। আসলে, কমিউনিস্ট সাম্রাজ্য এসে তার বাজার দখল করুক, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এটা চায়নি। এবং চায়নি, আন্তর্জাতিক সমাজে তার সর্বোচ্চ প্রভাবে কেউ ভাগ বসাক। যে-আদর্শ অনুসারে বড়ো মাছগুলো ছোটো মাছ খেয়ে বেঁচে থাকে, সেই আদর্শ অনুসারে কমিউনিজমের সঙ্গে পুঁজিবাদের লড়াই ছিলো অবশ্যম্ভাবী। বিংশ শতাব্দীর শেষে এবং একবিংশ শতাব্দীর গোড়ায় এসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এখন যে-নব্য বিশ্ব ধারার কথা বলছে অথবা মধ্যপ্রাচ্যে মধ্যস্থতার নামে যা করছে, সেও সভ্যতা এবং ব্যক্তি-স্বাধীনতার পোষকতা করার জন্যে নয়। বরং তার আসল উদ্দেশ্য হলো নিজের জাতীয় স্বার্থ বিস্তারের প্রক্রিয়াকে নিরঙ্কুশ করা। একটা সময়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বৈদেশিক সাহায্যের নামে ভিক্ষা দিয়ে দরিদ্র দেশগুলোয় তার প্রভাব বাড়ানোর চেষ্টা করতো। কিন্তু সাম্প্রতিক বছরগুলোতে, বিশেষ করে কোনো প্রতিপক্ষ পরাশক্তি না-থাকায়, সে ভিক্ষা দেওয়াও বন্ধ করেছে। উল্টো, সবার ওপরই সে ক্রমবর্ধমান মাত্রায় ছড়ি ঘোরাচ্ছে। এক সময়ে স্যাম চাচা নামে সে পরিচিত থাকলেও, এখন সে নিঃসন্দেহে সারা পৃথিবীর স্বাধিকারপ্রমত্ত জ্যেষ্ঠভ্রাতা।

বিশ শতকের জাতীয়তাবাদ, বস্তুত, কেবল দেশের প্রতি ভালোবাসা নয়; এ হলো দেশের অর্থনৈতিক এবং কূটনৈতিক স্বার্থ রক্ষা করার জন্যে অন্ধভাবে নিজের দেশকে সমর্থন করার মানসিকতা। এবং সেই মানসিকতাকে সজ্ঞানে এবং সক্রিয়ভাবে উস্কে দেওয়ার প্রবণতা। এর সঙ্গে শুধু একটা দেশ, জাতি অথবা সম্প্রদায়ের প্রতি ভালোবাসা নয়, ভিন্ন একটা দেশ, জাতি এবং সম্প্রদায়ের প্রতি সংঘর্ষের মনোভাব বর্তমান। এই মনোভাব থেকেই জার্মেনি অতো বড়ো একটা যুদ্ধের সূচনা করতে পেরেছিলো অথবা ষাট লাখ ইহুদীকে মেরে ফেলতে পেরেছিলো।[৯] জাপান নানকিং-এর ধর্ষণ-সহ[১০] অসংখ্য জায়গায় অকল্পনীয় নিপীড়ন করতে পেরেছিলো এবং পেরেছিলো যুদ্ধবন্দীদের ওপর পাশবিক নির্যাতন চালাতে।[১১] তাদের যুদ্ধের পেছনে যে-মনোভাব ক্রিয়াশীল ছিলো, তাকে তারা যে-নামই দিক না কেন অথবা যেভাবেই যুক্তিযুক্ত বলে প্রমাণ করতে চেষ্টা করুক না কেন, তার চেহারা যে একান্ত অমানবিক সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। তারা যখন তাদের এই অমানুষিক অভিযান শুরু করার প্রাক্কালে মন্দিরে গিয়ে অহিংসার প্রতীক বুদ্ধের কাছে আশীর্বাদ ভিক্ষা করে, তখন তার মধ্যে এক অদ্ভুত স্ববিরোধ লক্ষ্য করা যায়। এই হাস্যকর এবং শোচনীয় স্ববিরোধকে উপহাস এবং ভর্ৎসনা করেই রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন:

> গর্জিয়া প্রার্থনা করে / আর্তরোদন যেন জাগে ঘরে ঘরে।
> আত্মীয় বন্ধন করি দিবে ছিন্ন, / গ্রামপল্লীর রবে ভস্মের চিহ্ন, ...

বক্ষ ফুলায়ে বর যাচে / দয়াময় বুদ্ধের কাছে

কেবল জাতীয়তাবাদের নামে নয়, ক্ষমতাকে কেন্দ্রীভূত অথবা স্থায়ী করার চেষ্টা থেকেও রাষ্ট্রযন্ত্রও অনেক ক্ষেত্রে মানবতা-বিরোধী প্রবল ভূমিকা পালন করে। হিটলারের জার্মেনি থেকে শুরু করে স্তালিনের রাশিয়া, আফ্রিকানারদের দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে শুরু করে হুটুদের রোয়ান্ডা, শ্যারনের ইসরাইল থেকে শুরু করে কারাজিচের বসনিয়া, ইয়াহিয়ার পাকিস্তান থেকে শুরু করে তালেবানের আফগানিস্ত্রান, মাও-এর চীন থেকে পল পটের ক্যাম্পুচিয়া পর্যন্ত ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত রয়েছে রাষ্ট্রযন্ত্রের সন্ত্রাসী কার্যকলাপের। এসব দেশে কখনো কোনো একনায়কের কারণে, কখনো কোনো আদর্শের নামে সাধারণ মানুষের মৌলিক অধিকার পর্যন্ত খর্ব হয়। মানবতা তখন পিষ্ট হয় রাষ্ট্রযন্ত্রের তলায়।

দুর্ভাগ্যজনক হলেও, গত এক শতাব্দীতে এই রাষ্ট্রযন্ত্র ক্রমাগত একটা বিশাল দৈত্যের মতো প্রবল হয়ে উঠেছে। তার সামনে মানুষের সাধারণ অধিকারগুলো, এমন কি বেঁচে থাকার অধিকার পর্যন্ত, মূল্যহীন হয়ে পড়েছে। মানুষের জীবন অথবা অধিকারের চেয়েও রাষ্ট্র বেশি গুরুত্ব দিয়েছে তার নিজের অস্তিত্ব অথবা আধিপত্যের প্রতি। হিটলার, মুসোলিনি, স্তালিন, মাও, পল পট, বোথা, খোমেনি, সাদ্দাম, কারাজিচ, শ্যারন প্রমুখ বহু নেতার কথাই এ প্রসঙ্গে উলে-খ করা যেতে পারে, যাঁদের অধীনে রাষ্ট্র অথবা রাষ্ট্রীয় আদর্শই মানুষের চেয়ে বেশি মূল্যবান বলে গণ্য হয়েছে।

মানুষের প্রতি একান্ত অশ্রদ্ধা থেকেই রণকৌশল পর্যন্ত পাল্টে গেছে। গত এক শো বছরে যেসব যুদ্ধ হয়েছে, তা থেকে এটা সহজেই প্রমাণিত হয়। বিশে-ষণ করলেই দেখা যায় যে, সময়ের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে বেসামরিক মানুষ সামরিক হামলার লক্ষ্যে পরিণত হয়েছে। প্রথম মহাযুদ্ধে মৃতদের শতকরা ৫১ ভাগ ছিলো সাধারণ মানুষ।[১২] কিন্তু দু দশক পরে যখন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ অনুষ্ঠিত হয়, ততোদিনে যুদ্ধবাজ নেতাদের মনোভাব অনেকটা বদলে যায়। তার ফলে ক্রমবর্ধমান সংখ্যক সাধারণ মানুষ সামরিক লক্ষ্যে পরিণত হয়। হিটলারের জার্মেনিকে কাবু করার উদ্দেশে ব্রিটেনের বিমান বাহিনীর প্রধান যখন মরিয়া হয়ে একটি লক্ষ্য নির্ধারণ করেন, তখন বেছে নেন ড্রেজডেনকে।[১৩] কারণ সেখানে বেসারিক লক্ষবস্তু ছিলো অনেক বেশি। সেনাপতি এই বলে তাঁর হামলার পক্ষে যুক্তি দেন যে, বেসামরিক জনগণ বেশি নিহত না-হলে দেশের নৈতিক মনোবল ভেঙে পড়ে না। মিত্র বাহিনীর এই ধরনের যুদ্ধাপরাধকে গণহত্যা না-বলে রণকৌশলগত বোমাবর্ষণ বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। এই একই মানসিকতা থেকে জাপানের হিরোশিমা এবং নাগাসাকির ওপর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পারমাণবিক বোমার হামলা চালিয়েছিলো।[১৪] এই পরিবর্তিত রণকৌশলের ফলে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে নিহত সাধারণ মানুষের অনুপাত অনেক বৃদ্ধি পায়। বস্তুত, এই যুদ্ধে নিহতদের তিন ভাগের দু ভাগই ছিলো সাধারণ মানুষ। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ হওয়ার পর সাধারণ মানুষের ওপর যুদ্ধ চাপিয়ে দেওয়ার অপরাধে জার্মেনি এবং জাপানের স্বল্পসংখ্যক লোকের বিচার হয়েছিলো।[১৫] কিন্তু মানবতার বিরুদ্ধে এই ধরনের অপরাধ করার সত্ত্বেও মিত্র বাহিনীর যে-কর্মকর্তা অথবা সৈন্যরা সাধারণ মানুষ হত্যার জন্যে দায়ী ছিলো, তাদের কোনো বিচার হয়নি।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর অবস্থার আরও অবনতি হয়েছে। ১৯৭০-এর দশক থেকে বিভিন্ন যুদ্ধে যারা নিহত হয়েছে, এক পরিসংখ্যান অনুসারে, তাদের শতকরা ৮০ ভাগই বেসামরিক জনগণ।[১৬] বাংলাদেশের যুদ্ধও এর একটি জ্বলজ্যান্ত দৃষ্টান্ত। পাকিস্তানী সেনানেতৃত্ব বিশেষভাবে বেসামরিক জনগণকে তাদের লক্ষবস্তু বলে বিবেচনা করেছিলো। যুদ্ধের সঙ্গে ধর্ষণের ঘটনা সব দেশেই কমবেশি ঘটে। কিন্তু বাংলাদেশের যুদ্ধে এ অনুপাত ছিলো অনেক বেশি। সুনির্দিষ্ট অথবা নির্ভরযোগ্য তথ্য পাওয়া কঠিন, কিন্তু চার লাখ নারীকে এ সময়ে ধর্ষণ করা হয়েছিলো বলে দাবি করা হয়। এ ছাড়া, এই যুদ্ধের অংশস্বরূপ পাকিস্তানী সৈন্যরা সম্পত্তি লুণ্ঠনের এবং বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেওয়ার অসংখ্য ঘটনা ঘটিয়েছিলো। কিন্তু তা সত্ত্বেও যুদ্ধের শেষে যুদ্ধাপরাধীদের কোনো বিচার অনুষ্ঠিত হয়নি। ভারত দরাজ হাতে বাংলাদেশকে সাহায্য করেছিলো স্বাধীনতার যুদ্ধে, কিন্তু যুদ্ধশেষে নিজের জাতীয় স্বার্থে পাকিস্তানের সঙ্গে আপোশ করে সমস্ত যুদ্ধাপরাধীকে বেকসুর ছেড়ে দেয়।[১৭]

মোট কথা, বিশ শতকে বেসামরিক জনগণ ক্রমবর্ধমান সংখ্যায় রাষ্ট্রযন্তের শিকারে পরিণত হয়েছে। একটি হিশেবে দেখা যায় যে, বিশ শতকে রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্তের কারণে বিভিন্ন বর্ণ, ধর্ম এবং নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠীর নারী-শিশু-বৃদ্ধসহ মোট ছ কোটি লোক নিহত হয়েছে। ভিন্ন ধর্মের অনুসারী এবং ভিন্ন ভাষাভাষী বলে তুরস্ক প্রথম মহাযুদ্ধ শুরু

হওয়ার ঠিক পরে দশ লাখেরও বেশি আর্মেনীয়কে হত্যা করেছিলো। এই ঘটনা আর্মেনীয় গণহত্যা নামে পরিচিত হয়েছে। নাৎসি জার্মেনি এবং তাদের মিত্রদের হাতে ষাট লাখ ইহুদীসহ প্রায় এক কোটি লোক নিহত হয়।[১৮] নাইজেরিয়ায় নিহত হয়েছিলো হাউসা, ইবো এবং ওগোনি গোষ্ঠীর হাজার হাজার মানুষ। সাম্প্রতিক কালে সাদ্দাম হোসেনের হাতে হাজার হাজার কুর্দী এবং শিয়া মুসলমান প্রাণ হারিয়েছে। নির্যাতিত হয়েছে লাখ লাখ মানুষ। আবার পশ্চিমা দেশগুলি যখন ইরাকের ওপর হামলা চালায় তখন হাজার হাজার নিরপরাধ ইরাকী নিহত হয়। সে দেশের ওপর যে-সাড়ে ৮৮ হাজার টন বোমা ফেলা হয়েছে, তার শতকরা ৭০ ভাগই লক্ষবস্তুকে আঘাত না-করে অন্যত্র পড়েছে। তার ফলে সামরিক লক্ষবস্তুর ক্ষতি না-হয়ে ক্ষতি হয় অসামাররিক ধনসম্পত্তির।[১৯] বজনিয়ায় কারাজিচ এবং তাঁর সেনাপতি ম্-াডিচের প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপের ফলে হাজার হাজার মুসলমান নিহত হয়েছিলো। বিশেষ করে স্রেব্রানিচার[২০] দৃষ্টান্ত বিশে-ষণ করলে দেখা যায় যে, বসনিয়ার শাসকরা বেছে বেছে বেসামরিক লক্ষবস্তুর নির্ধারণ করে সন্ত্রাস এবং পাইকারী হত্যার মাধ্যমে নৃতাত্ত্বিক শুদ্ধি অভিযান চালিয়েছিলো। কারাজিচ এবং তাঁর সেনাপতি ম্-াডিচের উদ্দেশ্য ছিলো সুপরিকল্পিতভাবে বহুজাতিক বজনিয়া থেকে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান সম্প্রদায়কে বিতাড়িত করে এমন একটি রাষ্ট্র গঠন করা যেখানে কেবল সার্বরাই থাকবে। ক্রোয়াটদের তারা আগেই বিতাড়িত করতে সমর্থ হয়েছিলো।

দেশের প্রতি গভীর ভালোবাসা থাকা মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক। তদুপরি, বিংশ শতাব্দীতে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি ও শিক্ষার সম্প্রসার এবং জাতিগুলোর মধ্যে প্রতিযোগিতা বৃদ্ধির ফলে দেশ এবং জাতীয় স্বার্থ সম্পর্কে মানুষের সচেতনতা আগের চেয়ে অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে এই শতাব্দীতে কেবল ভালোবাসা নয়, দেশ এবং জাতির প্রতি সাধারণ মানুষের মধ্যে একটা অন্ধ আনুগত্য দেখা দেয়। প্রথম মহাযুদ্ধের আগে এই আনুগত্য এমন প্রবল হয়ে দেখা দেয় যে, আঠারো এবং উনিশ শতক ধরে যে-যুক্তিবাদ এবং উদারতা মানুষের দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রশস্ত করেছিলো, তার অনেকটাই সংকীর্ণ হয়ে পড়ে। কোনো কোনো আদর্শবাদী মানুষ এর সমালোচনা না-করে পারেননি। যেমন, রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথ তাঁর কবিতা এবং গানে বারবার দেশের প্রতি গভীর ভালোবাসা প্রকাশ করেছিলেন; কিন্তু পাশ্চাত্যে যে-অন্ধ দেশপ্রেম দেখা দিয়েছিলো, তিনি তার প্রশংসা করতে পারেননি। বরং তার নিন্দা করেছিলেন। যিনি বলেছিলেন: *দেবে আর নেবে মিলাবে মিলিবে*, যিনি লিখেছিলেন: *দেশে দেশে মোর ঘর আছে*, তাঁর পক্ষে স্বার্থান্ধ দেশাত্মবোধের প্রশংসা করা সম্ভব ছিলো না। আর সম্ভব ছিলো না বলেই, জাতীয়তাবাদী দেশগুলোতে রাতারাতি রবীন্দ্রনাথের ভাগ্য বিপর্যয় ঘটে। যে-রবীন্দ্রনাথের প্রতি ১৯১২/১৩ সালে পাশ্চাত্যে অতো উচ্ছ্বাস দেখা দিয়েছিলো, সেই রবীন্দ্রনাথ যখন ন্যাশনালইজমের সমালোচনা করে বক্তৃতা করেন, তখন জাপান থেকে অ্যামেরিকা পর্যন্ত সমগ্র উন্নত বিশ্ব তাঁকে প্রত্যাখ্যান করে।[২১] এখানেও দেখতে পাই, জাতীয়তাবাদীর চোখে মানুষের চেয়ে অথবা মানবতার চেয়ে দেশের প্রতি নির্বিচার ভালোবাসার আদর্শই বড়ো।

স্বাধীনতা সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ দেশপ্রেম আরও অন্ধ এবং উগ্র হতে পারে। দেশকে স্বাধীন করার জন্যে তখন আদর্শ নয়, ভালোমন্দ যে-কোনো পন্থাকেই যুক্তিপূর্ণ বলে গণ্য হয়। "মারি অরি, পারি যে কৌশলে।" একটা পন্থা যুক্তিপূর্ণ অথবা শ্রেয় কিনা, তা বিবেচনা না-করে তখন বরং লক্ষ্য দিয়ে অন্যায্য পন্থাকেও ন্যায্য বলে বিবেচনা করা হয়। কিন্তু আদর্শবাদীর চোখে তাকে গ্রহণযোগ্য মনে না-ও হতে পারে। বিশ শতকের গোড়ায় ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের পরিপ্রেক্ষিতে এমনি পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিলো। একদিকে সাধারণ লোকেরা যেমন রাজনীতি-সচেতন হয়ে পড়ছিলেন, অন্যদিকে ঔপনিবেশিক সরকার সেই সচেতনতার মুখে এমন এক-একটা পদক্ষেপ নিচ্ছিলো, যা সেই সচেতনতাকে আরও বাড়িয়ে দিচ্ছিলো। এই পরিস্থিতিতে সরকার যখন বঙ্গভঙ্গের সিদ্ধান্ত নেয়, তখন তা কেবল রাজনীতিকদের নয়, শিক্ষিত দেশপ্রেমিকদেরও বিচলিত করেছিলো। রবীন্দ্রনাথ এই সময়ে বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতা করে অনেকগুলি গান লেখেন এবং রাখি-বন্ধনের মতো অহিংস আন্দোলনে এগিয়ে আসেন। অপর পক্ষে, মোটামুটি একই সময়ে যুগান্তর এবং অনুশীলন দলের মতো রাজনৈতিক গোষ্ঠী সন্তাসের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জনের জন্যে তৎপর হয়ে ওঠে। ক্ষুদিরাম বসু, বাঘা যতীন, গোপীনাথ সাহা প্রমুখ[২২] এই পরিবেশেই জাতীয় বীরে পরিণত হন। বঙ্গদেশ এবং ভারতের বিভিন্ন অংশের রাজনীতি-সচেতন শিক্ষিত লোকেরা এঁদের আত্মত্যাগের প্রশংসা করেছিলেন। তাঁরা যে-সহিংস ও সন্ত্রাসী পথ বেছে নিয়েছিলেন, সমগ্র জাতি তাতে অন্যায় কিছুই দেখতে পায়নি। বরং তাকে গৌরবান্বিত করেছিলেন। কিন্তু আদর্শবাদী রবীন্দ্রনাথ এর অমানবিক দিকটি লক্ষ্য করে এঁদের আন্দোলনের পন্থাকে অনুমোদন করতে পারেননি, প্রশংসা করা দূরে থাক। কারণ, তাঁর কাছে স্বাধীনতা যেমন গুরুত্বপূর্ণ, সেই স্বাধীনতা অর্জনের

জন্যে আন্দোলনকারীরা কোন পন্থা অবলম্বন করছেন, তাও গুরুত্বপূর্ণ – হয়তো সমান গুরুত্বপূর্ণ। বস্তুত, তাঁর কাছে দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবাদের চেয়ে মানবতা এবং শ্রেয়তা আরও বড়ো। তখনকার রাজনীতিতে যাঁরা নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন, রবীন্দ্রনাথ গোড়াতে তাঁদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছিলেন; কিন্তু তিনি যখন দেখলেন যে, রাজনীতিকরা একদিকে হিন্দু-মুসলমানের মিলনের কথা বলছেন, অন্যদিকে, মুসলমানদের সঙ্গে এক ঘরে বসে জাত যাওয়ার ভয়ে জল খেতে পারছেন না, তখন তাঁদের কাছ থেকে সরে যেতে কুণ্ঠিত হননি। পরবর্তী সময়ে গান্ধীজীর সঙ্গে বেশ ঘনিষ্ঠতা হলেও, যখনই গান্ধীজীর পদক্ষেপ মানবতাকে উপেক্ষা করে কেবল রাজনৈতিক পন্থায় পরিণত হয়েছে, তখনই রবীন্দ্রনাথ তার প্রতিবাদ জানিয়েছেন।

প্রসঙ্গত, এ প্রশ্ন উত্থাপন করা যেতে পারে যে, মুক্তিসংগ্রাম জাতির জন্যে অবিমিশ্র প্রশংসার বস্তু হলেও এবং সেই সংগ্রামে যারা জীবন দেয়, তারা সেই জাতির চোখে শহীদ হলেও, এ সংগ্রামের ক্ষেত্রে বিবেক-বিবেচনা পুরোপুরি বর্জন করা কি সঠিক? দৃষ্টান্তস্বরূপ, আমরা বাঙালিরা আমাদের প্রিয় এবং গৌরবের স্বাধীনতা সংগ্রামের কথা উলে-খ করতে পারি। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে যাঁরা যোগ দিয়েছিলেন, বিশেষ করে যাঁরা আত্মত্যাগের মাধ্যমে আমাদের স্বাধীন করেছিলেন, তাঁরা আমাদের কাছে অসামান্য শ্রদ্ধার পাত্র। তাঁদের কাছে আমাদের ঋণ অপরিসীম। তাঁদের আত্মত্যাগের ফলেই আজ আমরা একটি স্বাধীন এবং আমাদের জীবনের মান এখন আগের তুলনায় উন্নত। কিন্তু তা সত্ত্বেও, এ প্রশ্ন সঙ্গতভাবেই জিজ্ঞেস করা যায় যে, তাঁরা যা কিছু করেছেন, সবই কি সমর্থনযোগ্য? তেমনি, ফিলিস্তিনী তরুণ-তরুণীরা আত্মত্যাগের মাধ্যমে ইসরাইলী রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে লড়াই করছে। তারা নিশ্চয় ফিলিস্তিনীদের চোখে শহীদ। কিন্তু ইসরাইলের যে-সাধারণ নরনারী, শিশু এবং বৃদ্ধকে তারা হত্যা করছে, তাদের অপরাধ কোথায়? গত দু দশক ধরে তামিল টাইগার গেরিলাদের বোমা হামলায় যে-শতশত সিংহলী বেসামরিক ব্যক্তি নিহত হয়, তাদেরই বা অপরাধ কোথায়? তারা কি আক্রমণের সঙ্গত লক্ষ্য বলে বিবেচিত হতে পারে? আমার ধারণা, মুক্তিসংগ্রাম এবং সন্ত্রাসবাদের মধ্যে পার্থক্য বিরাট নয়, বরং এদের মধ্যে যে-ভেদরেখা তা নিতান্তই সূক্ষ্ম। মুক্তিযোদ্ধারা যদি শত্রুর সামরিক লক্ষবস্তুর ওপর আক্রমণ চালায়, তা হলে তা অবশ্যই যুক্তিপূর্ণ লক্ষ্য বলে বিবেচিত হতে পারে, কিন্তু অসামরিক লক্ষ্যই আক্রমণের অযোগ্য বলে গণ্য হওয়া উচিত।

একই সংজ্ঞা অনুযায়ী মানবকল্যাণের নামে যখন রাজনৈতিক বিপ-ব শুরু হয় এবং নিরপরাধ লোকেরা তার শিকারে পরিণত হয়, তখন তাকে মানবতা-বিরোধী না-বলে পারা যায় না। বড়ো কোনো বিপ-বের আগে সে সমাজে সাধারণত মূল্যবোধের অবক্ষয় এবং রাজনৈতিক টানাপোড়েন দেখা দেয়। তার পরিপ্রেক্ষিতে আদর্শবাদে উদ্বুদ্ধ কিছু মানুষ যখন বৃহত্তর মঙ্গলের নামে অন্য মানুষকে হত্যা করতে শুরু করে, তখন সেখানে কমবেশি অতিরেক দেখা দেওয়াই স্বাভাবিক। অতীতের দৃষ্টান্ত পর্যালোচনা করে ঐতিহাসিক ক্রেইন ব্রিন্টন বিপ-ব-পরবর্তী পর্যায়গুলির বিশে-ষণ করেছেন। তিনি দেখেছেন যে, বিপ-বের মধ্য দিয়ে একটি সরকার উৎখাত হওয়ার পর সাময়িকভাবে আদর্শবাদ তুঙ্গে ওঠে। কিন্তু দেশ চালানোর বাস্তবতার মুখে সেই আদর্শবাদ ধীরে ধীরে ভেঙ্গে পড়ে। তখন ক্ষমতা দখলের জন্যে বিভিন্ন উপদলের মধ্যে দেখা দেয় দ্বন্দ্ব। এই পরিবেশেই গৃহযুদ্ধ এবং হানাহানি শুরু হয়। সে জন্যে, সমস্ত বিপ-বের পরই অনাবশ্যক সন্ত্রাস এবং রক্তপাত প্রায় অবশ্যম্ভাবী। যেমন, ফরাসি বিপ-বকে কেন্দ্র করে প্রভূত রক্তপাত হয়েছিলো। এমন কি, সাম্প্রতিক ইরানী বিপ-বের পরও বহু নিরপরাধ লোক উচ্ছৃঙ্খলতা, প্রতিশোধ এবং ক্ষমতা দখলের রাজনীতির শিকারে পরিণত হয়। বস্তুত, বিপ-ব বস্তুটাই এ জন্যে মানবতাবাদীর চোখে সন্দেহের বিষয়, যদিও মিল্টন থেকে কান্ট এবং হেগেল পর্যন্ত সবাই একে বৃহত্তর কল্যাণের দোহাই দিয়ে সমর্থন করেছিলেন। জন মিল্টন মনে করেছিলেন যে, বিপ-ব সমাজের সুপ্ত সম্ভাবনাকে বাস্তবায়িত করার সুযোগ দিতে পারে। অপর পক্ষে, ইমানুয়েল কান্ট বিপ-বের পক্ষে এই বলে মত দিয়েছিলেন যে, বিপ-বের শক্তি মানব সভ্যতাকে এগিয়ে দিতে পারে। বিপ-বের পরে অনেক ত্যাগ এবং ভোগান্তি হতে পারে, তিনি তাও লক্ষ্য করেছিলেন, কিন্তু তাঁর দৃষ্টিতে বৃহত্তর মঙ্গলের জন্যে সেই ত্যাগ স্বীকার না-করে উপায় নেই। হেগেলের দৃষ্টিতে বিপ-ব কেবল প্রয়োজন নয়, এটা হলো মানুষের সত্যিকার সম্ভাবনা বিকাশের প্রকৃষ্ট পন্থা।

মার্কিন বিপ-ব হয়েছিলো দেশকে স্বাধীন করার মহৎ লক্ষ্য থেকে। আর ফরাসি বিপ-বের পেছনে সাম্য, মৈত্রী এবং ভ্রাতৃত্বের যে-আদর্শগুলি ক্রিয়াশীল ছিলো, নিঃসন্দেহে সেগুলো মহৎ এবং অনুকরণযোগ্য। মনুষ্যত্ব বিকাশের সহায়ক। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখি, এই দুই বিপ-বকে কেন্দ্র করে প্রচুর রক্তপাত ঘটেছিলো। বিশেষ করে ফরাসি

বিপ-বের পর দীর্ঘদিন চলেছিলো সন্ত্রাসের রাজত্ব। কোনো যুক্তি দিয়েই এই সন্ত্রাসের পক্ষে সাফাই গাওয়া কঠিন। রাজা অথবা সামন্ত শ্রেণীর লোকেরা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে সাধারণ মানুষের ওপর অত্যাচার করেছে, তাদের শোষণ করেছে, এ কথা ঠিকই; কিন্তু এই যুক্তি দেখিয়ে রাজপরিবারের অথবা সামন্তপরিবারের নারী-শিশুসহ অন্যান্য সদস্যদের পাইকারীভাবে গিলোটিন করার ঘটনাকে সমর্থন করা যায় না। তেমনি বলশেভিক বিপ-বের পরও রাশিয়ায় কেবল জারের পরিবারের ওপর নয়, নিরপরাধ বহু লোকের ওপর একই ধরনের অত্যাচার করা হয়েছিলো। সেও সমান নিন্দার বিষয়।

ইরানের বিপ-বের পেছনে অন্যতম লক্ষ্য ছিলো অত্যাচারী শাহের রাজতন্তকে উৎখাত করা। সে বিপ-বের প্রধান অনুপ্রেরণা ছিলেন ধর্মীয় নেতা রুহোল-াহ খোমেনি। তাঁরই নেতৃত্বে ১৯৭৯ সালের পয়লা এপ্রিল ইরানের জনগণ রাজতন্ত্র উৎখাত করে ইসলামী প্রজাতন্ত্রের পত্তন করে। কিন্তু কার্যকালে প্রজাতন্ত্র নয়, ইরানে প্রতিষ্ঠিত হলো ধর্মীয় একনায়কত্ব। শাহের নির্যাতন সত্ত্বেও যে-ইরান আধুনিকতার পথে এগিয়ে যাচ্ছিলো, সেই ইরান মোল-াতন্ত্রের অধীনে সামনের দিকে না-এগিয়ে দ্রুতগতিতে পেছনের দিকে ছুটতে শুরু করলো। মৌলবাদীদের প্রথম কোপই পড়লো মহিলাদের ওপর। যে-ইরানে নারীদের অনেকেই লেখাপড়া শিখে স্বাবলম্বী হচ্ছিলো, মৌলবাদী ইসলামী বিধান অনুযায়ী সেই মেয়েদের রাতারাতি পর্দার অন্তরালে চলে যেতে হলো। ঘরের বাইরে মেয়েদের নানা ধরনের কার্যকলাপতো বন্ধ হলোই, এমন কি, নিম্নতম পর্যায় থেকে উচ্চতম পর্যায় পর্যন্ত মেয়েদের লেখাপড়াও ব্যাহত হলো। তারপর শুরু হলো মোল-াদের সঙ্গে শাসকদের বিরোধ। এমন কি, মোল-াদের নানা উপদলের মধ্যেও অন্তর্বিরোধ দেখা দিলো। রক্তারক্তি আর বোমাবাজির মধ্যে দেশের বুদ্ধিজীবীরা অনেকেই পালিয়ে গেলেন পশ্চিমা দেশগুলোতে। এবং গোটা দেশ এতো পিছিয়ে গেলো যে, ইসলামী বিপ-ব শুরু হওয়ার সময়ে দেশের শিক্ষা, শিল্প, বাণিজ্যের যে-অবস্থা ছিলো, দু দশক পরেও সে সেখানে ফিরে যেতে পারেনি। এগিয়েছে কেবল উগ্রবাদ এবং যুদ্ধে।

একই আদলে পরবর্তী কালে আফগানিস্তানের তালিবানতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো। তালিবান-আশ্রিত আল-কাইদা বাহিনী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ওপর হামলা না-চালালে, আফগানিস্তানের নারীরা, মানুষরা কবে নিপীড়নযন্ত্রের হাত থেকে মুক্তি পেতো কে জানে! সত্যি বলতে কি, এই দুই ধর্মীয় একনায়কতন্তই নির্মম হাতে মানুষের ওপর অত্যাচার করেছে। তবে কেবল এই দুই বিপ-ব নয়, প্রতিটি বিপ-ব এবং উপপ-বের পরই প্রতিশোধমূলক হত্যা এবং নির্যাতনের ঘটনা ঘটে। বিপ-বের নামে অনেক ক্ষেত্রেই পূর্ব-শত্রুতার শোধ নেওয়া হয়। এর সঙ্গে মানুষের কল্যাণের কোনো যোগাযোগ নেই।

মানব সভ্যতার ইতিহাস যাঁরা রচনা করেছেন, অথবা সেই ইতিহাসের যাঁরা উলে-খযোগ্য এবং মৌলিক ব্যাখ্যা দিয়েছেন, তাঁদের একজন কার্ল মার্কস। বিশে-ষণ করে তিনি বলেছিলেন যে, প্রাকৃতিক শক্তির বিরুদ্ধে মানুষ লড়াই করে প্রথমত নিজে বেঁচে থাকার জন্যে। কিন্তু তার এই লড়াই-এর ফলে কেবল সে-ই বেঁচে থাকে না, তা থেকে অন্যরাও লাভবান হয়। বিশেষ করে উন্নত উৎপাদন ব্যবস্থা চালু হবার পর থেকে মানুষ নিজের প্রয়োজনের তুলনায় বেশি উৎপাদন করছে। এবং সেই বাড়তি উৎপাদন দিয়ে অন্যরাও লাভবান হচ্ছে। কিন্তু সেই উদ্বৃত্ত উৎপাদন দিয়ে বেশি লাভবান হচ্ছে যাদের পুঁজি আছে এমন স্বল্পসংখ্যক মানুষ। অন্যের পরিশ্রমে তারা বেঁচে থাকে। কেবল তাই নয়, যে-মানুষ সত্যি সত্যি ঘাম ঝরিয়ে উৎপাদন করে, তার চেয়েও ভালোভাবে বেঁচে থাকে। মার্কসের চোখে এটা ন্যায্য নয়। হেগেলের আদর্শ ধরে তিনি তাই মনে করেন যে, এক সময়ে এই শ্রমজীবী মানুষরা সচেতন হয়ে উঠলে তাদের শোষণ বন্ধ হবে এবং বিপ-বের মধ্য দিয়ে কায়েম হবে একটা শোষণহীন সমাজব্যবস্থা।

এই সমাজ ব্যবস্থা কি প্রক্রিয়ায় কায়েম হবে, কারা এর নেতৃত্ব দেবে, তার সুস্পষ্ট পরিকল্পনা অবশ্য মার্কসে নেই। মার্কসের মৃত্যুর পর লেনিন সেই উপায় বাতলে দেন। তাঁর মতে, স্বল্পশিক্ষিত শ্রমিকরা এই বিপ-বের নেতৃত্ব দিতে পারে না, এই নেতৃত্ব দিতে পারে শিক্ষিত ব্যক্তিদের একটা সংগঠিত দল। একটা কমিউনিস্ট পার্টি। কারণ, তাঁর মতে, অ-সংগঠিত সর্বহারারা বিপ-বে জয়ী হতে পারবে না। কিন্তু লেনিনও শহরের শিল্প-কর্মীদের দিয়ে বিপ-ব ঘটানোর স্বপ্ন দেখেছিলেন। গ্রামের অসংখ্য চাষীদের এই বিপ-ব সম্পর্কে সচেতন করার অথবা বিপ-বের কাজে তাদের ব্যবহার করার পরিকল্পনা তিনি করেননি। সেই কাজ করেছিলেন মাও। তিনি অসংখ্য নীরব চাষীকে বিপ-বের প্রতি সচেতন করে তুলেছিলেন এবং বিপ-বে তাদের সক্রিয় অংশ গ্রহণের ব্যবস্থা করেছিলেন।

মার্কসের শোষণহীন আদর্শ সমাজ গঠন করার তত্ত্ব লেনিন-সহ অনেককেই উদ্বুদ্ধ করেছে। এ রকমের শোষণহীন

সমাজ গঠিত হলে সেটা আদর্শ বলেও অবশ্যই বিবেচিত হতে পারে। কিন্তু পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের দিকে তাকালে বাস্তবে দেখা যাচ্ছে, আদর্শ সমাজ গঠন নয়, অনেকের কাছে মার্কসবাদ ক্ষমতা দখলের এবং সেই ক্ষমতাকে কুক্ষিগত করার একটা রাজনৈতিক হাতিয়ার। যারা একবার এই আদর্শ দিয়ে ক্ষমতা দখল করেছে, তারা মানব কল্যাণের বদলে সেই ক্ষমতাকে চিরস্থায়ী করার কথাই বেশি ভেবেছেন। মার্কসবাদ তখন মানব-কল্যাণের আদর্শ না-হয়ে একটা ডগমায় পরিণত হয়েছে। মার্কসবাদকে বাস্তবায়িত করার হাতিয়ার হিশেবে লেনিন পার্টির কথা বলেছিলেন। কিন্তু মানুষের চেয়ে পার্টিকে তিনি বড়ো করে দেখেছিলেন কিনা সন্দেহ করি।

অপর পক্ষে, লেনিনের মৃত্যুর পর ১৯২৪ সালে যোসেফ স্তালিন যখন ক্ষমতা লাভ করেন, তখন তিনি মানবকল্যাণের বদলে পার্টিকেই সর্বোচ্চ আসনে বসান। তাঁর বিবেচনায় মানুষের জন্যে পার্টি নয়, পার্টির জন্যে মানুষ। মানবকল্যাণের নামে, মার্কসবাদের নামে তিনি তাই অসংখ্য লোককে সরিয়ে দিতে অথবা খতম করতে দ্বিধা করেননি। শ্রম-শিবিরে পাঠিয়ে অত্যাচার করতে কুণ্ঠিত হননি। এমন কি, কৃত্রিম দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি করে ইউক্রেনের প্রায় পনেরো লাখ মানুষকে অনাহারে মারার পরিকল্পনাও নিয়েছিলেন তিনি ঠাণ্ডা মাথায়। তাতে বিবেকের কোনো দংশন তিনি অনুভব করেননি। তিনি যে-কাল্ট ফিগারে পরিণত হন, সেখানে তিনি সর্বশক্তিমান একজন ধর্মপ্রবর্তকের মতো। তিনি কমিউনিজম এবং পার্টির যে-ব্যাখ্যা দিতেন, সেটাই ছিলো গ্রহণযোগ্য সর্বোচ্চ ব্যাখ্যা।[২৩]

কয়েক দশক পরে মাও জে দোংও একই রকমের কাল্ট ফিগারে পরিণত হন। চীনের কমিউনিস্ট দলে তাঁর বাক্যই বেদবাক্যে পরিণত হয়। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ব্যাখ্যা ধীরে ধীরে দুর্বল হতে থাকে। শ্রমিক এবং চাষীদের সমর্থন নিয়ে তিনি যে-কমিউনিস্ট ব্যবস্থা গড়ে তুলেছিলেন, দু দশকের মধ্যে সেই ব্যবস্থার ভেতর থেকেই শিক্ষিত একটি এলিট শ্রেণী ক্ষমতাবান হয়ে ওঠে। পার্টি, রাষ্ট্রযন্ত্র এবং উৎপাদন ব্যবস্থায় সর্বত্র এই শ্রেণীর প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। তখন তাদের সরিয়ে দেওয়ার উদ্দেশে ১৯৬৬ সালে কমিউনিজমের নতুন ব্যাখ্যা দিয়ে মাও একটি সাংস্কৃতিক বিপ-ব শুরু করেন।[২৪] এর নাম সাংস্কৃতিক বিপ-ব হলেও, এটি ছিলো আসলে একটি নির্মম অমানুষিক বিপ-ব। বিশেষ করে শিক্ষিত এলিট শ্রেণীর ওপর লাল প্রহরীদের যে-ধরনের নির্যাতন শুরু হয়, তা ইহুদীদের ওপর ১৯৩০-এর দশকে নাৎসিদের নির্যাতনের কথা মনে করিয়ে দেয়। কেবল ৪০-এর দশকের গোড়ায় নাৎসিরা যে-ইহুদী নিধনযজ্ঞ আরম্ভ করে, সাংস্কৃতিক বিপ-বের সময়ে তার পুনরাবৃত্তি হয়নি। কিন্তু তা সত্ত্বেও অন্য আর-পাঁচটি বিপ-বের মতোই এ বিপ-বও ছিলো মানবতা-বিরোধী। যে-আদর্শের দোহাই দেওয়া হোক না কেন, এটা ছিলো আসলে মাও-এর রাজনৈতিক প্রভাব এবং ক্ষমতাকে পোক্ত করার পন্থা। তার সঙ্গে মানবকল্যাণের কোনো যোগাযোগ ছিলো না।

মাও জে দোং-ই এ ব্যাপারে সর্বশেষ নন। মার্কসীয় মানব-কল্যাণের নামে এবং চাষীভিত্তিক কমিউনিস্ট ব্যবস্থা গড়ে তোলার নামে পাইকারীভাবে লাখ লাখ মানুষকে হত্যা করার সর্বসাম্প্রতিক নজির তৈরি করেন পল পট। হয়তো সজ্ঞানেই স্তালিনের শ্রম-শিবিরের আদর্শ তিনি অনুকরণ করেছিলেন, হয়তো ভেবে থাকবেন যে, সেই বাধ্যতামূলক শ্রমের মধ্য দিয়ে দেশ গড়ে তোলা সম্ভব হবে, মানুষের কল্যাণ সাধিত হবে, সেই সঙ্গে তিনিও স্থায়ীভাবে থাকতে পারবেন ক্ষমতার মঞ্চে। কিন্তু তাঁর আদর্শ যাই হোক না কেন, স্তালিনের তুলনায় তিনি ছিলেন অনেক নির্মম। স্তালিন পনেরো-বিশ লাখ মানুষকে হত্যা করতে প্রায় তিরিশ বছর সময় নিয়েছিলেন; অপর পক্ষে, খেমার রুঝ মাত্র চার বছরের মধ্যে খতম করেছিলো লাখ বিশেক লোক। কেবল বাধ্যতামূলক শ্রম দিয়ে তারা এই অসাধ্য সাধন করেনি, নির্যাতন এবং বে-আইনী প্রাণদণ্ডকেও তারা ব্যাপকভাবে কাজে লাগিয়েছিলো। পল পটও আদর্শবাদের কথা বলেছিলেন, কিন্তু তাঁর চোখে মানুষের মঙ্গলের জন্যে আদর্শ নয়, বরং আদর্শের জন্যেই মানুষ। সুতরাং সেই অন্ধ আদর্শের স্টীম রোলারের তলায় মানুষ পিষ্ট হয়ে গেলে সেটাকে তাঁর কাছে অসঙ্গত মনে হয় না।

মাওবাদের আদর্শ দিয়ে উদ্বুদ্ধ নকশাল আন্দোলনও[২৫] সহিংসতার পথ বেছে নিয়েছিলো। কিন্তু কার্যকালে কেবল সম্পন্ন চাষী এবং জোতদারসহ অল্প কিছু লোককে খতম করা ছাড়া তেমন কোনো মানবকল্যাণ তারা করতে পারেনি। শেষ পর্যন্ত তাদের আন্দোলন পুরোপুরি ব্যর্থ হয়।

বস্তুত, মার্কসের আদর্শ যাই হোক না কেন, বলশেভিক বিপ-ব থেকে আরম্ভ করে আশি বছরের চেয়েও বেশি সময় ধরে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন নেতার অধীনে যে-তথাকথিত মার্কসবাদী আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, সে আদর্শ মানবতার নয়; বরং সে আদর্শ বাক-স্বাধীনতা, ব্যক্তি-স্বাধীনতা ও সামগ্রিকভাবে মৌলিক অধিকার হরণ এবং নির্যাতনের

মাধ্যমে একটি নিষ্ঠুর রাষ্ট্রযন্ত্র স্থাপনের। গোড়াতে মার্কস যে-শোষণহীন সমাজব্যবস্থা কায়েমের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, কমিউনিস্ট সরকারগুলো তাও পালন করতে পারেনি। এসব দেশে সাধারণ মানুষের শ্রমের বিনিময়ে সরাসরি সুবিধাভোগী কিছু ব্যক্তি হয়তো লাভবান হয়নি, কিন্তু লাভবান হয়েছে রাষ্ট্রযন্ত্র। কমিউনিস্ট দেশগুলো মানুষের সাম্য স্থাপনের কোনো নজিরও তৈরি করেনি। উল্টো, চীনসহ কমিউনিস্ট দেশগুলোতে নগর এবং গ্রামের মানুষ, পার্টির কর্মী এবং সাধারণ মানুষ, আমলা এবং সাধারণ শ্রমিকের মধ্যে যথেষ্ট অর্থনৈতিক পার্থক্যই গড়ে উঠেছে। স্বীকার করতে হবে, এসব দেশে এক ধরনের আদর্শবাদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, কিন্তু সে আদর্শবাদ মানবতা-বর্জিত। মানুষের মঙ্গল, এমন কি, খোদ মানুষ সে আদর্শবাদের চোখে গৌণ মাত্র। বরং মনে হয়, মার্কসবাদকে কাজে লাগিয়ে যে-গোষ্ঠীগুলো ক্ষমতায় এসেছে, তারা সেই ক্ষমতাকে চিরস্থায়ী করে রাখার উৎকৃষ্ট উপায় হিশেবেই একে ব্যবহার করেছে।

আসলে, মানবকল্যাণের কথা ভেবে যুগে যুগে দার্শনিক এবং মহাপুরুষরা যেসব আদর্শের ধারণা গড়ে তুলেছিলেন, সেসব আদর্শের অনেকগুলি এখন কেবল তত্ত্বগতভাবেই বেঁচে আছে। এসব দার্শনিক এবং মহাপুরুষদের প্রচারিত আদর্শের নাম ভাঙিয়ে এখন যারা করে খাচ্ছে, তাদের কাছে মানবকল্যাণ কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো তাদের নিজেদের গুরুত্ব। তাদের ফয়দা। যে-আদর্শ দিয়ে মানুষ সত্যিকার মানুষ হয়ে উঠেছিলো, সেই আদর্শই এখন প্রধানত ধর্মপ্রচারক এবং রাজনীতিকের হাতে পারমাণবিক বোমার চেয়েও ভয়ানক অস্ত্রে পরিণত হয়েছে। পারমাণবিক বোমা দিয়ে লাখ লাখ মানুষকে মারা সম্ভব, কিন্তু মনুষ্যত্বকে মারা যায় না। অপর পক্ষে, বিকৃত আদর্শের হাতিয়ার দিয়ে মনুষ্যত্বকে মুছে ফেলে মানুষকে জন্তুতে পরিণত করা সম্ভব।

বর্তমান বিশ্বে আদর্শ-বিকৃতির দরুন মানুষ এবং সভ্যতা যে-নজিরবিহীন সংকটের মুখোমুখী হয়েছে, তা থেকে মুক্তির কোনো উপায় আছে কি? অন্তত সহজ কোনো উপায় নেই – এটা নির্দ্বিধায় বলা যেতে পারে। দার্শনিক এবং মহাপুরুষেরা একদিন মানুষকে ভালোবাসার এবং মানব-কল্যাণের যে-আহ্বান জানিয়েছিলেন, সেই আদর্শ মনেপ্রাণে গ্রহণ করতে পারলেই সেটা সম্ভব হতে পারে। তার জন্যে প্রথমেই বিশ্বাস করতে হবে: সবার উপরে মানুষ সত্য; বিশ্বাস করতে হবে: মানুষের চেয়ে বড়ো কিছু নাই – দেশ, জাতি, বর্ণ, ধর্ম – কোনো কিছুই মানুষের চেয়ে বড়ো নয়। কিন্তু বিভিন্ন ডগমা দিয়ে গত এক শতাব্দী ধরে আমাদের যে-রকম মগজ ধোলাই হয়েছে, তাতে কট্টরপন্থা ত্যাগ করে উদারতা, যুক্তিবাদ এবং নৈতিকতার আদর্শে আবার দীক্ষা নেওয়া একপ্রকার অসম্ভব।

জানুআরি-মে, ২০০২

[১] ১৯৯৪ সালের ৬ এপ্রিল থেকে শুরু করে পরবর্তী দু সপ্তাহের মধ্যে রোয়ান্ডায় এক অভূতপূর্ব গণহত্যা অনুষ্ঠিত হয়। অভূতপূর্ব এ জন্যে যে, এর আগে অন্য কোনো গণহত্যায় এতো অল্প সময়ের মধ্যে এতো বেশি লোক নিহত হয়নি। এমন কি, হিটলারের নাৎসি জার্মেনি তার গ্যাস-চেম্বারসহ মানুষ মারার নানা রকমের আধুনিক ব্যবস্থা নির্মাণ সত্ত্বেও এতো লোককে এমন তড়িৎ গতিতে মের ফেলতে পারেনি। রোয়ান্ডায় হুটুদের সংখ্যা টুটসিদের তুলনায় অনেক বেশি। কিন্তু সংখ্যালঘু হলেও বহু বছর ধরে টুটসিরা ছিলো শাসক সম্প্রদায়। ব্যবসাবাণিজ্যেও তাদের ছিলো আধিপত্য। তবে ১৯৯৪ সালে ক্ষমতায় ছিলো একটি হুটু সরকার। টুটসি নিধনে কেবল সরকার নয়, রোয়ান্ডার খৃস্টীয় চার্চের কর্মকর্তারাও কেউ কেউ সহায়তা করেছিলেন। গণহত্যার বছর খানেক পরে যুদ্ধাপরাধের যে-আন্তর্জাতিক বিচার অনুষ্ঠিত হয়, তাতে এই ধর্মযাজকদেরও কেউ কেউ বিচারের সম্মুখীন হন। শিশু, নারী এবং বৃদ্ধসহ টুটসিদের ওপর পাইকারিভাবে যে-ঝটিকা আক্রমণ শুরু হয়, তাতে প্রথম দু সপ্তাহে অন্তত পাঁচ লাখ লোক নিহত হয়েছিলো বলে মনে করা হয়। এই পাইকারি হত্যাকাণ্ডে বাধা দেওয়ায় এক হাজারের বেশি হুটুও নিহত হয়েছিলো।

[২] তুরস্কে ভিন্ন ভাষাভাষী এবং ভিন্ন ধর্মাবলম্বী আর্মেনীয়দের সংখ্যা ছিলো প্রায় ২০ লাখ। তুরস্কের তথাকথিত "ইয়ং টার্কস পার্টি" এই জনগোষ্ঠীকে অবিশ্বাসের চোখে দেখেছিলো এবং জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী মনে করেছিলো। এদের প্রতি তাদের দৃষ্টিভঙ্গি ছিলো অনেকটা নাৎসিরা যেমন ইহুদীদের দেখেছিলো, তেমন। প্রথম মহাযুদ্ধ শুরু হওয়ার ঠিক পরে এই দলের কেন্দ্রীয় কমিটি এদের খতম করার এবং দেশ থেকে তাড়িয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়।

যাঁরা এই সিদ্ধান্ত নেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন মহামেদ পাশা, ইসমাইল আনোয়ার পাশা এবং আহমেদ জামাল পাশা। ১৯১৫ সালের ২৪ এপ্রিল তারিখে ইস্তাম্বুলে (তখনকার কনস্ট্যান্টিনোপল) বসবাসকারী আর্মেনীয় সম্প্রদায়ের সবচেয়ে সুপরিচিত বুদ্ধিজীবী এবং নেতৃস্থানীয় লোকেদের মধ্য থেকে তিন শো লোককে একত্রিত করে ঠাণ্ডা মাথায় হত্যা করা হয়। সেই একই দিনে আরও পাঁচ হাজার আর্মেনীয়কে ইস্তাম্বুলের রাস্তায় খুন করা হয়। এর পর বাকি আর্মেনীয়দের বলা হয় যে, তাদের অন্যত্র পাঠানো হবে। কিন্তু আসলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় দেশের পুব অঞ্চলের মরুভূমিতে পাঠিয়ে তাদের অনাহারে মেরে ফেলার। দীর্ঘ যাত্রা পথেই হাজার হাজার আর্মেনীয় না-খেয়ে এবং তাদের প্রহরীদের নির্যাতনে মারা যায়। পরবর্তী বছর খানেকেরও বেশি সময় ধরে এই গণহত্যা চলতে থাকে। তবে তুরস্কের পক্ষে একমাত্র ভালো যা বলা যায়, তা হলো পরবর্তী সময়ে ফরিদ পাশার সরকার এই গণহত্যাকারীদের বিচার করে এবং প্রধান নেতাদের মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করে।

[৩] বাবরি মসজিদ ভেঙে ফেলার ঘটনা অন্তত দুটি কারণে দুর্ভাগ্যজনক। প্রথমত, চার শো বছরের পুরোনো একটা মসজিদের আর কিছু না-থাকলেও অন্তত স্থাপত্যের দিক দিয়ে একটা ঐতিহাসিক মূল্য ছিলো। দ্বিতীয়ত, বাবর ছিলেন বিশেষ করে পরধর্মের প্রতি সহনশীল। তাঁর নামের সঙ্গে জড়িত একটা মসজিদ জঙ্গী আদর্শবাজরা ভেঙে ফেললো, এটা পরধর্মের প্রতি সহনশীলতার প্রমাণ দেয় না।

[৪] এখন বাংলায় মৌলবাদ বললে বিশেষ করে ইসলামী মৌলবাদ বোঝালেও, মৌলবাদ শব্দটি এসেছে খৃস্টানদের কাছ থেকে। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ইভ্যানজেলিকল গোষ্ঠীগুলো, যাদের অনেকটা বর্তমান ইসলামী তাবলীগী গোষ্ঠীগুলোর সঙ্গে তুলনা করা যায়, সেই গোষ্ঠীগুলো এই আন্দোলন শুরু করে। অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে এরা অনেকে বিধাতার বিধান এই যুক্তিতে আফ্রিকা থেকে আনা কৃষ্ণাঙ্গদের দাসত্ব প্রথাকে সমর্থন জানাতো।

[৫] ইন্দোনেশিয়ায় চীনারা সংখ্যায় খুব কম হলেও ব্যবসা-বাণিজ্যে তাদের প্রভাব ছিলো অনেক বেশি। ইন্দানেশীয় রুপির দাম রাতারাতি পড়ে যাওয়ার পর দেশের অর্থনীতিতে যে-ঢল নামে এবং তাকে কেন্দ্র করে যে-ব্যাপক দাঙ্গাহাঙ্গামা হয়, তার শিকারে পরিণত হয় চীনারা। সম্পত্তি লুণ্ঠন, সম্পত্তিতে অগ্নিসংযোগ, হত্যা এবং নারীদের ধর্ষণ-সহ দাঙ্গার সনাতন উপায়গুলি সংখ্যাগুরু মুসলমানরা দক্ষতা এবং ক্ষিপ্রতার সঙ্গে প্রয়োগ করে। পর্তুগীজরা পূর্ব তিমুর ছেড়ে যাওয়ার পর প্রধানত খৃস্টান অধ্যুষিত এই দ্বীপে ইন্দোনেশিয়া দু দশক ধরে যে-নির্যাতন চালায়, তাতে অন্তত দু লাখ লোক নিহত হয়েছিলো। সুকর্ণের পতনের সময়ে এই দেশে কমিউনিস্টদের ওপর যে-অত্যাচার চালানো হয়, তাও এ প্রসঙ্গে মনে করা যেতে পারে।

[৬] নোয়াম চমস্কির চমৎকার একটি লেখা আছে ভিয়েতনামের ওপর মার্কিন নির্যাতনের। এটি প্রকাশিত হয় বার্ট্রান্ড রাসেলের ভিয়েতনাম যুদ্ধাপরাধ ট্রাইবিউনালের প্রতিবেদনের ভূমিকা হিশেবে। এই একই বই-এ রাসেল এবং জঁ পল সার্ত্রের দুটি প্রবন্ধেও অনেক তথ্য এবং তত্ত্ব আছে।

[৭] ১৯৬৮ সালের ১৬ মার্চ সকাল সাড়ে সাতটায় মার্কিন সৈন্যদের একটি দল দক্ষিণ চীন সাগরের উপকূলের একটি ছোট্টো গ্রাম – মাই লাইতে প্রবেশ করে এবং গ্রামের নিরস্ত্র সাধারণ লোকের ওপর হামলা চালিয়ে নারী, শিশু এবং বৃদ্ধসহ ৩৪৭জন গ্রামবাসীকে হত্যা করে। এই গ্রামের ওপর নির্যাতন এতো পাশবিক ছিলো যে, হিউ টমসন-সহ কয়েকজন মার্কিন সৈন্য গ্রামবাসীদের বাঁচানোর জন্যে অন্য মার্কিন সৈন্যদের ওপর অস্ত্র উঁচিয়ে রুখে দাঁড়ায়। এবং তাদের মধ্য থেকে কয়েকজন পরে এই তথ্য প্রকাশ করে দেয়। কিন্তু প্রায় এক বছরের আগে পর্যন্ত এই মর্মান্তিক ঘটনার কথা মার্কিন জনগণ জানতে পারেনি। এই ঘটনার কথা ব্যাপকভাবে প্রকাশের পর উইলিয়াম ক্যালি নামে একজন সেনা কর্মকর্তার বিচার এবং কারাদণ্ড হয়, যদিও কয়েক বছর পরে রিচার্ড নিক্সন তাকে ক্ষমা করেন। এই ঘটনার পর থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সাধারণ মানুষের মনোভাব ভিয়েতনামে লড়াই চালানোর বিরুদ্ধে চলে যায়। এই প্রতিকূল জনমত তৈরি হওয়ার পেছনে আরও কারণ ছিলো, কিন্তু একটা প্রধান কারণ হলো মাই লাই-এর ঘটনার ব্যাপক প্রচার। এর কয়েক বছর পরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এ যুদ্ধে পরাজিত হয়ে ফিরে আসতে বাধ্য হয়। এই যুদ্ধের জন্যে আনুমানিক ব্যয় হয়েছিলো ২০ হাজার কোটি ডলার। গোটা বিশ শতকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মানবতার সেবামূলক কাজে এতো অর্থ ব্যয় করেছে কিনা আমার জানা নেই। কিন্তু হাজার হাজার লোক প্রাণের বিনিময়ে নিজেদের কমিউনিস্ট-বিরোধী আদর্শবাদকে রক্ষা করতে গিয়ে এমন দরাজ হাতে ব্যয় করতে দ্বিধা বোধ করেনি।

[৮] মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাম্রাজ্যবাদী মনোভাবকে সে দেশের এবং আন্তর্জাতিক সমাজে অনেকেই নিন্দা

জানিয়েছিলেন। এমন কি, ভিয়েতনামে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যে-যুদ্ধাপরাধ করেছিলো, বার্ট্রান্ড রাসেল এবং আরও কিছু বিখ্যাত ব্যক্তি তার বিচারের জন্যে স্টকহোমে একটি বেসরকারী ট্রাইব্যুনাল গঠন করেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আগ্রাসী মনোভাবের কোনো পরিবর্তন হয়নি। বস্তুত, এর পরেও অন্যান্য এলাকার মধ্যে দক্ষিণ অ্যামেরিকার কতোগুলো দেশে তার হস্তক্ষেপের নীতি অব্যাহত থাকে। মুক্তবিশ্বের আদর্শের কথা কপচালেও বারবার সে প্রমাণ করে যে, তার কাছে জাতীয় স্বার্থই সবচেয়ে মূল্যবান। তার জন্যে কখনো কখনো নির্লজ্জভাবে দ্বৈতমানদণ্ড অনুসরণ করতে তার মোটেই আটকায়নি।

[৯] উপনিবেশ বিস্তারের প্রতিযোগিতায় ইউরোপের অন্যান্য জাতির তুলনায় জার্মেনি পিছিয়ে থাকায় সে দেশে যে-তীব্র ক্ষোভ ছিলো, ক্ষমতায় এসে হিটলার সেই ক্ষোভকেই প্রবল জাতীয়তাবাদে পরিণত করেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এ জাতীয়তাবাদ কেবল অন্য দেশের বিরুদ্ধে নির্দেশিত ছিলো না, নিজের দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যে সফল ইহুদীদের বিরুদ্ধেও পরিচালিত হয়েছিলো। ১৯৩৩ সালে চ্যান্সেলর নির্বাচিত হওয়ার এক মাস পরেই হিটলার ইহুদী-বিরোধী নীতিমালা গ্রহণ করেন। তখন থেকেই ইহুদীদের ওপর পদ্ধতিগতভাবে বিবিধ নির্যাতন শুরু হয়। (১৮ সংখ্যক নোট দ্রষ্টব্য।) হিটলারের মতো নির্মম একনায়ক এবং মানবতাবিরোধী ইতিহাসেই বিরল। (আশ্চর্যের বিষয়, সম্প্রতি বাংলাদেশে এক "ঐতিহাসিক" হিটলারের প্রশস্তিমূলক একটি লেখা লেখেন এবং তা বাঙালি ছাত্রদের পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত হয়।)

[১০] ১৯৩৭ সালের নভেম্বর মাসে তীব্র প্রতিরোধের মুখে সাংহাইতে চীনা সৈন্যদের হারিয়ে দেওয়ার পর ১৩ই ডিসেম্বর ৫০ হাজার বিজয়ী জাপানী সৈন্য চীনের রাজধানী নানকিং-এ প্রবেশ করে। তারা এই শহরে ঢোকে সবাইকে হত্যা, সবকিছু লুট করা এবং পুড়িয়ে দেওয়ার নীতি নিয়ে। প্রিন্স আসাকা ইয়াসুহিকোর প্রত্যক্ষ নেতৃত্বে পরবর্তী ছ থেকে সাত সপ্তাহ জাপানী সৈন্যরা এই শহরে এক ধ্বংসযজ্ঞ চালায়। তখন এই শহরে প্রায় ছ লাখ লোক বাস করতো। তাদের অর্ধেককেই জাপানীরা নিহত করে। হত্যার করার জন্যে তারা যেসব পন্থা অবলম্বন করে, তার মধ্যে ছিলো গুলি করা, পেট কাটা, হৃৎপিণ্ড বের করে ফেলা, মুণ্ডচ্ছেদ করা, আগুনে পুড়িয়ে মারা, জ্যান্ত মাটিতে পুতে মারা, মুগুর দিয়ে পিটিয়ে মারা ইত্যাদি। তা ছাড়া, জ্যান্ত মানুষকে জাপানী সৈন্যরা গুলি চালানোর লক্ষবস্তু হিশেবে ব্যবহার করতো। শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ কেটে নেওয়া, জিভের সঙ্গে বড়শি লাগিয়ে ঝুলিয়ে হত্যা করা, কোমর পর্যন্ত মাটিতে পুতে কুকুর দিয়ে কামড়িয়ে হত্যা করা ইত্যাদি যতো রকমের অত্যাচার করার কথা জাপানীরা তাদের উর্বর মস্তিষ্ক দিয়ে ভাবতে পেরেছিলো, তার সবই কাজে লাগানো হয়। তখন সৈন্যরা আর-একটা খেলায় মেতেছিলো, সে হলো: কে কজনকে হত্যা করতে পারলো, তার প্রতিযোগিতা করা। এই প্রতিযোগিতায় কে কতো স্কোর করলো সে খবর প্রকাশিত হতো *আশাহি শিম্বুনের* মতো জাতীয় দৈনিক পত্রিকায়। ধর্ষণ ছিলো মেয়েদের ওপর অত্যাচারের একেবারে নগণ্য ঘটনা। অনেক সময়েই তারা মেয়েদের স্তন টুকরো টুকরো করে কেটে ফেলতো, তাদের দেয়ালের সঙ্গে পেরেক দিয়ে গেঁথে দিতো, পিতাদের বাধ্য করতো কন্যাদের ধর্ষণ করতে, ছেলেদের বাধ্য করতো মায়েদের ধর্ষণ করতে, এবং পরিবারের অন্যদের বাধ্য করতো এই বীভৎস দৃশ্য দেখতে। সত্যি বলতে কি, জাপানীরা ধর্ষণ এব নির্যাতনের নানা রকমের খেলা বের করেছিলো এবং হত্যাকেও পরিণত করেছিলো এক রকমের খেলায়। ধর্ষণ বোধহয় সব দেশের সৈন্যরাই কমবেশি করে, কিন্তু জাপানীদের এ ব্যাপারে কোনো সীমা-পরিসীমা ছিলো না। কোরিয়া এবং চীনের মহিলাদের শিবিরে বন্দী রেখে তারা মাসের পর মাস সারা দিন ধরে লাইন দিয়ে ধর্ষণ করতো। এখন এ রকমের মহিলাদের বলা হচ্ছে "কমফোর্ট উইমিন"। এ রকমের মহিলারা যারা বেঁচে গেছে, তারা অনেকে সম্প্রতি জাপানীদের বিরুদ্ধে ক্ষতিপূরণের মামলা এনেছে।

[১১] যুদ্ধবন্দীদের ওপর অত্যাচার কমবেশি সব দেশেই হয়। কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে জাপান তার বন্দীদের ওপর যা করেছিলো, তা বোধহয় জার্মেনিকেও হার মানিয়েছিলো। বস্তুত, তখনো পর্যন্ত এর কোনো নমুনা ছিলো না। দৃষ্টান্তস্বরূপ যুদ্ধবন্দীদের দিয়ে বর্মা-থাইল্যান্ড রেল লাইন বসানোর কথা অনেকে বলেন। বন্দীদের দিয়ে কঠোর পরিশ্রম করানো হতো। কিন্তু তাদের খুব সামান্যই খেতে দেওয়া হতো। যখন-তখন তাদের মেরে ফেলাসহ নানা ধরনের অত্যাচার চালানো হতো তাদের ওপর। জ্যান্ত লোকেদের কোনো রকম অবশ করার ওষুধ না-দিয়েই তাদের দেহে অস্ত্রোপচার করে নানা রকম চিকিৎসা বিজ্ঞানের পরীক্ষা-নিরীক্ষাও করা হতো।

[১২] **দ্রষ্টব্য:** E. Markusen and D. Kopf, *The Holocaust and Strategic Bombing: Genocide and Total War in the Twentieth Century* (West Press, 1994), chapter 2.

[১৩] ড্রেজডেনের ওপর তুমুল বোমাবর্ষণের ঘটনা ঘটে ১৯৪৫ সালের ১৩ ফেবরুআরি রাতের বেলা। সে রাতে ৮০০ জঙ্গী বিমান নিয়ে এই হামলা চালায় ব্রিটিশ বিমান বাহিনী। তার পরের দিন, ১৪ ফেবরুআরি দিনের আলোতে, ৪০০ বিমান নিয়ে এই হামলা অব্যাহত রাখে মার্কিন বিমান বাহিনী। ১৫ ফেবরুআরি তারিখে হামলা চালানো হয় ৪০০ বিমান নিয়ে। দোসরা মার্চের আক্রমণে অংশ নেয় ৪০০ বিমান এবং ১৭ এপ্রিল তারিখে সর্বশেষ হামলায় অংশগ্রহণকারী বিমানের সংখ্যা ছিলো ৫৭২। বলা হয়েছে যে, সোভিয়েত সৈন্যরা যাতে পুব দিক থেকে হামলা চালাতে পারে তার সুযোগ দেওয়ার জন্যে এই বিমান আক্রমণ করা হয়েছিলো। কিন্তু আসলে এই অভূতপূর্ব বোমাবর্ষণ থেকে একটি অত্যন্ত সুন্দর নগরী ধ্বংস করা ছাড়া বিশেষ কোনো লাভ হয়নি। এই আক্রমণের ফলে নিহত হয় প্রধানত বেসামরিক লোকেরা এবং মৃতের সংখ্যা ছিলো প্রায় এক লাখ বা তার চেয়েও বেশি। এতো বেশি মৃতদেহ পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছিলো যে, মৃতদের সঠিক সংখ্যা কখনোই নির্ণয় করা সম্ভব হয়নি।

[১৪] প্রবল শক্তি নিয়ে যুদ্ধ শুরু করলেও ১৯৪৫ সালে জাপান দুর্বল হতে থাকে। এই অবস্থায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জাপান জয়ের পরিকল্পনা করে। এর আগে জাপান পার্ল হার্বারে মার্কিন ঘাঁটির ওপর আকস্মিক হামলা চালিয়ে যে-ব্যাপক ক্ষতি করেছিলো, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তা কখনোই ভুলে যেতে পারেনি। তারা বোমাবর্ষণের মাধ্যমে ধীরে ধীরে জাপানকে দুর্বল করে দিয়ে শেষ পর্যন্ত জাপান দখলের কৌশল গ্রহণ করে। ৯ এবং ১০ মার্চ রাতের বেলায় মার্কিন বাহিনী টোকিওর ওপর ন্যাপাম বোমা দিয়ে যে-আক্রমণ চালায়, তাতে ৮০ হাজার লোক নিহত হয় এবং কাঠের তৈরি বেশির ভাগ বাড়ি পুড়ে যাওয়ায় দশ লাখ লোক গৃহহীন হয়। বলা বাহুল্য, এই লোকেদের বেশির ভাগই ছিলো বেসামরিক নাগরিক। এর সঙ্গে প্রতিতুলনা করা যায় ওকিনোয়ার যুদ্ধকে। এপ্রিল থেকে জুলাই মাস পর্যন্ত এই যুদ্ধ চলে। সেখানে ১২ হাজার মার্কিন সৈন্য নিহত হয়। আহত হয় ৩৪ হাজার। অপর পক্ষে, নিহত জাপানীদের সংখ্যা ছিলো প্রায় এক লাখ। কিন্তু এর পরেও জাপান তার যুদ্ধ চালিয়ে যায়। জাপানকে আত্মসমর্পণে বাধ্য করার জন্যে অতঃপর মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান নতুন কৌশল নেন। ১৯৪১ সালের জুন মাস থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিজ্ঞানীরা শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে পারমাণবিক বোমা নিয়ে যে-গবেষণা শুরু করেছিলেন, তাতে সাফল্য আসে ১৯৪৫ সালে। ১৬ জুলাই তারিখে তাঁদের তৈরি একটি বোমা নিউ ম্যাক্সিকোতে পরীক্ষা করে দেখা হয়। এই বিস্ফোরণের শক্তি ছিলো ১৫০০০ টন টিএনটির সমান। ট্রুম্যান এই ব্যাপকবিধ্বংসী বোমা দিয়ে জাপানের ওপর আক্রমণ চালানোর সিদ্ধান্ত নেন। তিনি আপাতদৃষ্টিতে এই সিদ্ধান্ত নেন এ জন্যে যে, এর ফলে মার্কিন সৈন্যবাহিনীর ক্ষয়ক্ষতি কম হবে। পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণের তিন সপ্তাহ পরে মার্কিন বিমানবাহিনীর একটি বি-২৯ বিমান হিরোশিমার ওপর পারমাণবিক বোমা ফেলে। এর ফলে তখনই প্রায় আশি হাজার লোক নিহত হয়। আহতের সংখ্যা ছিলো আরও ৭০ হাজার। এবং পরবর্তী কালে তেজস্ক্রিয়তা থেকে হাজার হাজার লোক অকালে প্রাণ হারায়। তিন দিন পরে, নাগাসাকির ওপর দ্বিতীয় একটি পারমাণবিক বোমা ফেলা হয়। তাতে তৎক্ষণাৎ মৃতের সংখ্যা ছিলো প্রায় চলি-শ হাজার। আহতের সংখ্যাও ছিলো অনুরূপ। আর তেজস্ক্রিয়তা থেকে গত অর্ধশতাব্দী ধরে প্রাণ দিয়েছেন অনেকেই। বেসামরিক নাগরিকদের ওপর এই দুই বিশাল বোমা হামলার পর জাপানের পক্ষে আত্মসমর্পণ করা ছাড়া অন্য কোনো বিকল্প পথ খোলা ছিলো না। সাম্রাজ্য বিস্তারের তাদের গোলাপী স্বপ্ন এভাবে ভেঙে যায়, কিন্তু তার জন্যে স্বদেশে এবং কোরিয়া ও চীনসহ সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় লাখ লাখ লোককে প্রাণ দিতে হয়। ভারতবর্ষেও তার ঢেউ এসে লেগেছিলো। হাজার হাজার ভারতীয় সৈন্য দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার সময়ে প্রাণ দিয়েছিলো।

[১৫] দ্বিতীয় মহাযদ্ধের পর মিত্রবাহিনী যুদ্ধাপরাধ বিচারের জন্যে একটি ট্রাইব্যুনাল গঠন করে। ১৯৪৫ সালে নভেম্বরে এই ট্রাইব্যুনাল বিচার আরম্ভ করে। এই বিচার নুর্নবার্গের বিচার নামে পরিচিত। দশ মাস বিচারে নাৎসি-নেতাদের মাত্র ১৯জন দণ্ডিত হয়। তাদের মধ্যে ১২জনকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। জাপানের যুদ্ধাপরাধীদের বিচার শুরু হয় ১৯৪৬ সালে। সেখানে বিচার হয়েছিলো পঁচিশ জনের। তবে ব্রিটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, অস্ট্রেলিয়া ইত্যাদি দেশের আদালতে আরও প্রায় দু হাজার মামলার বিচার হয়।

[১৬] E. Markusen and D. Kopf, *The Holocaust and Strategic Bombing: Genocide and Total War in the Twentieth Century, Chapter 2.*

[১৭] ভারত এবং বাংলাদেশের যুক্ত কম্যান্ডের কাছে যে-পাকিস্তানী সৈন্যরা আত্মসমর্পণ করেছিলো, তাদের সংখ্যা ছিলো ৯৩ হাজার। অনেক দর কষাকষির পর এক সময়ে ভারত প্রতীক স্বরূপ ১০০জন যুদ্ধাপরাধীর বিচার করতে

রাজি হয়েছিলো, কিন্তু ভারত এবং পাকিস্তানের পারস্পরিক স্বার্থের ভিত্তিতে যে-সিমলা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়, সেই চুক্তি অনুসারে পাকিস্তানের সব সৈন্যই ছাড়া পায়। তাদের মধ্যে ধর্ষণকারী, লুণ্ঠনকারী, গৃহে-অগ্নিসংযোগকারী, খুনী, পাইকারী হত্যাকারী ইত্যাদি সব রকমের অপরাধীই ছিলো।

[১৮] ১৯৩৩ সালের জানুআরি মাসে হিটলার ক্ষমতায় আসার এক মাস পর থেকে প্রধানত ইহুদীদের ওপর নিপীড়ন শুরু হয় এবং তারপর বারো বছর ধরে এই নিপীড়ন অব্যাহত থাকে। প্রথম পাঁচ বছর চালানো হয় রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক অধিকার থেকে ইহুদীদের বঞ্চিত করার কর্মসূচী। ১৯৩৫ সালে তাদের জার্মান নাগরিকত্বও লোপ করা হয় এবং অন্য জার্মান নাগরিকদের সঙ্গে তাদের বিয়ে নিষিদ্ধ হয়। কিন্তু তখনো তাদের হত্যা করার কর্মসূচী আরম্ভ হয়নি। ১৯৩৮ সালের ৯ এবং ১০ নভেম্বর রাতের বেলায় তাদের প্রায় প্রতিটি সিন্যাগগ ভেঙে ফেলা হয়। তারপরই বন্দীশিবিরে আটক করা হয় হাজার হাজার ইহুদীকে। এমন কি, তাদের ছেলেমেয়েদের স্কুলে যাওয়াও নিষিদ্ধ হয়। এ সময়ে তাদের প্রায় সমস্ত সম্পত্তি তাদের কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া হয়, এমন কি তাদের চাকরি-বাকরি করার অধিকারও বাতিল করা হয়। কিন্তু ব্যাপকহারে তাদের হত্যা করার কর্মসূচী ১৯৪১ সালের আগে পর্যন্ত নেওয়া হয়নি। ১৯৩১ থেকে ৪১ সালের মধ্যে অনেক ইহুদীই অন্যান্য দেশে চলে যেতে বাধ্য হয়। এক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেই এ সময়ে দেড় লাখের বেশি ইহুদী অভিবাসন করে। আর মাদাগাস্কার পরিকল্পনা অনুযায়ী ১৯৪০ সালে নাৎসি জার্মেনি সিদ্ধান্ত নেয় যে, ইহুদীদের সবাইকে মাদাগাস্কার দ্বীপে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। কিন্তু ব্রিটেন এবং রাশিয়ার সঙ্গে লড়াই চলতে থাকায় এই পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করা সম্ভব হয়নি। তার বদলে ১৯৪২ সালের জানুআরি মাসে নাৎসি কর্মকর্তারা "চূড়ান্ত সমাধান" নামে পরিচিত একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তাঁরা ঠিক করেন যে, পূর্বাঞ্চলের ইহুদীদের কাউকে কাউকে "খতম" করা হবে, কিন্তু বাকিদের পাঠানো হবে বন্দীশিবিরে অথবা শ্রমশিবিরে। কর্মকর্তারা ঠাণ্ডা মাথায় পরিকল্পনা করেছিলেন যে, ন্যূনতম খাদ্য এবং কঠোর পরিশ্রমের ফলে শ্রমশিবিরের ইহুদীরাও শেষ পর্যন্ত মারা যাবে। কিন্তু এসবের মাধ্যমে যখন ব্যাপক হারে ইহুদীদের খতম করা গেলো না, তখন নাৎসিরা আশ্‌উইশ, ত্রেবলিঙ্কা, মায়দানেক ইত্যাদি জায়গায় ইহুদীদের হত্যা করার আরও "কারখানা" নির্মাণ করে। এসব জায়গাতে গ্যাস দিয়ে ইহুদীদের হত্যা করে তাদের মৃতদেহ পোড়ানোর ব্যবস্থা নেওয়া হয়। ধারণা করা হয় যে, এসব কারখানায় ৪০ লাখ ইহুদীকে পদ্ধতিগতভাবে হত্যা করা হয়েছিলো। আর, জার্মেনির হাতে মোট নিহত ইহুদীর সংখ্যা ছিলো প্রায় ৬০ লাখ। For details, see E. Markusen and D. Kopf, pp. 120-33.

[19] E. Markusen and D. Kopf, Chapter 2.

[২০] বসনিয়ার স্রেব্রেনিচা একটি মুসলমান-প্রধান শহর। ১৯৯৫ সালের জুলাই মাসে যুদ্ধে মুসলমানদের পরাজয় যখন অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে, তখন জাতিসঙ্ঘ এই শহরকে তাদের সংরক্ষিত নিরাপদ এলাকা বলে ঘোষণা করে। এই শহরে প্রায় ৩০ হাজার মুসলমান আশ্রয় নিয়েছিলো। তাদের রক্ষা করার জন্যে দায়িত্ব দেওয়া হয় ডাচ সৈন্যদের। কিন্তু সেই সৈন্যদের নিষ্ক্রিয়তার মুখে রাৎকো শ-াডিচ এবং রাদিস্-াভ কৃস্তিচের সার্ব সৈন্যরা এই শহরে ঢুকে পড়ে। তারপর ১১ই জুলাই তারিখে তারা বন্দী পুরুষ এবং নারীদের আলাদা করে পুরুষ এবং ছেলেদের অন্যত্র নিয়ে যায়। ঐ দিনই তারা জিজ্ঞাসাবাদ করার পর প্রায় পাঁচ শো পুরুষকে হত্যা করে। তবে হত্যা করার আগে এই লোকেদের দিয়ে তারা বিশাল কবর খোঁড়ায় এবং তারপর লাইন করে দাঁড় করিয়ে তাদের গুলি করে। তারপর শ খানেক বন্দীকে দিয়েই আবার মৃতদেহগুলো কবরে ফেলে। অতঃপর এই বন্দীদের আদেশ দেওয়া হয়, তাদের খবর খুঁড়তে। দাবি করা হয় যে, এখানে প্রায় ৪০০ মুসলমানকে জ্যান্ত কবর দেওয়া হয়েছিলো। গণ-কবর আবিষ্কারের পর রেড ক্রস মোট সাত হাজার উনআশিজন মৃতের তালিকা তৈরি করে। তবে বেসরকারী হিশেব অনুযায়ী মৃতের সংখ্যা আট থেকে দশ হাজার। তা ছাড়া, যে-মহিলা এবং অপ্রাপ্তবয়স্ক মেয়েদের ওপর ধর্ষণ চালানো হয়, তাদের সংখ্যাও ছিলো অনেক। সাড়ে তিন বছরের মেয়ের ওপর ধর্ষণের ঘটনাও ঘটেছিলো এখানে। বসনিয়ার তখনকার শাসক কারাজিচ এবং সেনাপতি শ-াডিচের বিরুদ্ধে যুদ্ধাপরাধের অভিযোগ আনা হয়েছে। তবে এখনও তাদের গ্রেফতার করা সম্ভব হয়নি, অথবা তাদের বিচার হয়নি। অবশ্য রাদিস্-াভ কৃস্তিচকে বিচারের জন্যে আন্তর্জাতিক ট্রাইবিউনালের সামনে দাঁড়াতে হয় ২০০০ সালের বসন্ত কালে। ২০০২ সালে ডাচ সৈন্যদের এই নিষ্ক্রিয়তার ওপর একটি রিপোর্ট প্রকাশিত হলে নেদারল্যান্ডের সরকারের পতন হয় এবং তখনকার প্রধান সেনাপতিও পদত্যাগ করেন।

[২১] এ বিষয়ে চমৎকার আলোচনা করেছেন কৃষ্ণা দত্ত এবং অ্যানড্রু রবিনসন তাঁদের (জধনরহফৎধহধঃয ঞধমড়ৎব: ঞযব গুৎরধফ-সরহফবফ গধহ (খড়হফড়হ: ইষড়ড়সংঁৎু, ১৯৯৫) গ্রন্থে, পৃ. ২০০-১৮)।

[২২] ক্ষুদিরাম বসু এবং প্রফুল- চাকী কোনো সামরিক ব্যক্তির ওপর আক্রমণ করেননি। এমন কি, তখনকার ঔপনিবেশিক সরকারের কোনো উচ্চপদস্থ কর্মকর্তার ওপরও নয়। তাঁদের লক্ষ্য ছিলেন একজন বিচারক, কিংসফোর্ড। তবে ১৯০৮ সালের ৩০ এপ্রিল তারিখে তাঁরা গাড়ির ওপর বোমা ছুঁড়ে দিয়ে যাদের হত্যা করতে সমর্থ হন, তারা দুজন ইংরেজ মহিলা। প্রফুল- চাকী অতঃপর আত্মহত্যা করেন। সাড়ে তিন মাস পরে ক্ষুদিরামের ফাঁসি হয়। তিনি এর পর জাতীয় বীরে পরিণত হন। তাঁর প্রতি পরাধীন ভারতে এবং তারপর ভারত স্বাধীন হওয়ার পরেও সাধারণ মানুষের মনোভাব কেমন ছিলো, তার একটা পরোক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায় *ভারতকোষে* কমলা দাশগুপ্তের লেখা তাঁর জীবনী থেকে। এতে তাঁকে একটি ইসলামী অনুষঙ্গের বিশেষণ দিয়ে "শহীদ" আখ্যায়িত করা হয়। বাঘা যতীন (যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়) সন্ত্রাসমূলক স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশ নিয়ে বিখ্যাত হন। প্রথম মহাযুদ্ধ শুরু হওয়ার ঠিক পরে তিনি যুগান্তর দলের নেতা হন এবং জার্মান অস্ত্র আমদানি করে ইংরেজদের সঙ্গে লড়াই করার অবাস্তব পরিকল্পনা করেন। ১৯১৫ সালের ৯ সেপ্টেম্বর তারিখে তিনি চারজন সঙ্গী নিয়ে পুলিশের সঙ্গে যুদ্ধ করেন এবং পরের দিন হাসপাতালে মারা যান। তাঁর একজন সঙ্গী ঘটনাস্থলেই নিহত হন। অন্য দুজনের ফাঁসি হয়। আর একজন জেলে মারা যান। তাঁদের বীরত্বের কাহিনী প্রায় কিংবদন্তীতে পরিণত হয়। গোপীনাথ সাহা হত্যা করতে চেয়েছিলেন কলকাতার পুলিশ কমিশনার চার্লস টেগার্টকে। ১৯২৪ সালের জানুআরি মাসে তিনি কলকাতায় রাস্তায় গুলি করে যাকে হত্যা করেন তিনি একটা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা ছিলেন। মার্চ মাসে গোপীনাথের ফাঁসি হয়। সত্যি বলতে কি, বাংলায় যে-সন্ত্রাসমূলক স্বাধীনতা আন্দোলন হয়, তাতে ইংরেজ কর্মকর্তা, বলতে গেলে, কেউই নিহত হননি। হত্যা করা হয়েছিলো কয়েকজন ভারতীয়কে, যাঁরা ছিলেন প্রধানত আইনজীবী এবং পুলিশের অধস্তন কর্মকর্তা। বরং পশ্চিম ভারতের সন্তাসীরা তুলনামূলকভাবে বেশি ইংরেজ কর্মকর্তা মারার ব্যাপারে সফল হয়েছিলো। বলা বাহুল্য, সন্ত্রাসমূলক স্বাধীনতা আন্দোলন তখনকার জনগণের মনে ব্যাপক উৎসাহের সৃষ্টি করলেও, শেষ পর্যন্ত স্বাধীনতা এসেছিলো প্রধানত কংগ্রেসের রাজনৈতিক আন্দোলনের ফলে।

[২৩] স্তালিন ছিলেন অসম্ভব নির্দয় চরিত্রের মানুষ। তাঁর কাছে আদর্শ অথবা মানবতা নয়, বরং ক্ষমতা ছিলো অনেক বেশি মূল্যবান। সে জন্যে তিনি দলের ভেতরে এবং বাইরে যেখানে যতো শিক্ষিত এবং পেশাদার লোক ছিলেন, যাঁরা তাঁকে চ্যালেঞ্জ জানাতে পারতেন, তাঁদের ওপর অসাধারণ অত্যাচার শুরু করেন। তাঁদের সরিয়ে দিতে অথবা প্রয়োজনবোধে তাঁদের হত্যা করতে তিনি কুণ্ঠিত হননি। ১৯৩৯ সালের ফেব্রুআরি মাসের আগেই তিনি ১৯১৭ সালের বলশেভিক বিপ-বে যাঁরা অংশ নিয়েছিলেন, তাঁদের প্রায় সবাইকে খতম করেন। এ ছাড়া, তিনি দেশের অর্থনীতি গড়ে তোলার অংশ হিশেবে তিনি যে-শ্রমশিবিরের পরিকল্পনা করেন, সেই পরিকল্পনা অনুযায়ী ৭০ লাখ থেকে দেড় কোটি লোককে শ্রমশিবিরে পাঠান। তিনি ইউক্রেনের ওপরও একই নীতি প্রয়োগ করেন। ১৯২৯ সাল থেকে তিনি ইউক্রেনের পাঁচ হাজার জ্ঞানী-বিজ্ঞানী, সাংস্কৃতিক কর্মী এবং ধর্মীয় নেতাকে তাঁরা সামরিক অভ্যুত্থান করার চেষ্টা করছিলেন, এই অজুহাত দেখিয়ে আটক করেন। এঁদের অনেককে গুলি করে হত্যা করা হয়, আর অনেককে নির্বাসন দেওয়া হয় রাশিয়ার প্রত্যন্ত অঞ্চলে অবস্থিত বন্দীশিবিরে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়েও স্তালিন স্বদেশের অসংখ্য লোককে সুপরিকল্পিতভাবে হত্যা করেন। তা ছাড়া, ইউক্রেনে যাদের ২৪ একর অথবা তার চেয়ে বেশি জমি ছিলো, তেমন খামার মালিকদের খতম করার নীতি গ্রহণ করা হয়। এদের অনেককেই নির্বাসন দেওয়া হয় সুদূর সাইবেরিয়ায়। অনেকে আবার গ্রামের সাধারণ শ্রমিকে পরিণত হয়। মোট কথা, ইউক্রেনের কৃষিব্যবস্থার ওপর স্তালিনের কঠোর নির্যাতন এমনভাবে নেমে আসে যে, ১৯৩২ থেকে ৩৪ সালে সে দেশে দারুণ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। দেশের ভেতরে প্রচুর জমানো খাদ্যশস্য ছিলো, কিন্তু একনায়ক স্তালিনের নির্দেশে তা অন্যত্র পাঠানো হয়। ফলে ইউক্রেনে লাখ লাখ লোক অনাহারে মারা যায়। অনেকের ধারণা, মানুষের তৈরি এই দুর্ভিক্ষে পনেরো লাখ পর্যন্ত লোক প্রাণ হারিয়েছিলেন। স্তালিনের বিশ্বাস ছিলো তাঁর নীতিমালা বাস্তবায়নের জন্যে কমিউনিস্ট পার্টি এবং রাষ্ট্রযন্ত্র উভয়কে চূড়ান্ত রকমের ক্ষমতা দেওয়া দেওয়া দরকার। তা ছাড়া, তিনি মানবতাবাদীদের বক্তব্যকে বস্তাপচা উদারনীতি বলে আখ্যায়িত করেন।

[২৪] চীনা কেন্দ্রীয় কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে শিক্ষিত উদারপন্থীদের ক্ষমতাবৃদ্ধির ফলে ১৯৬০-এর দশকের গোড়ার দিকে মাও সত্যিকার ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু থেকে অনেকটাই সরে যান। তা ছাড়া, তিনি মনে করেন যে, চীন আসলে রাশিয়ার পথকেই অনুসরণ করছে এবং শেষ পর্যন্ত তার আন্দোলন ব্যর্থ হবে। কমিউনিস্ট পার্টি তখন যাঁরা চালাচ্ছিলেন, বিপ-বের প্রতি তাঁদের আন্তরিক প্রতিশ্রুতি কতোটা, তাতেই তিনি সন্দিহান হন। সে জন্যে তিনি

তাঁর ভাবধারায় বিশ্বাসী নেতাদের হাতে দলের দায়িত্ব ন্যস্ত করার উদ্যোগ নেন। তিনি তাঁর আদর্শ বাস্তবায়িত করার জন্যে শহরের তরুণ সমাজকে ব্যাপকভাবে কাজে লাগান। এই তরুণদের বলা হয় লাল প্রহরী। যাতে লাল প্রহরীরা মাও-এর নির্দেশ সংবলিত লাল গ্রন্থ নিয়ে বিনা বাধায় শুদ্ধি অভিযান চালাতে পারে, তার জন্যে তিনি কমিউনিস্ট পার্টি এবং সৈন্য বাহিনীকে এই অভিযানে বাধা না-দেওয়ার নির্দেশ দেন। এই কাজে তিনি তখনকার প্রতিরক্ষামন্ত্রী লিন পিয়াও এবং তাঁর স্ত্রী জিয়াং চিংকেও সহায়ক হিশেবে পেয়েছিলেন। চেন পোতা, কাং শেং, ওয়াং তুং শিংও তাঁকে বিশেষ সহায়তা করেন। ওদিকে, দেশ পরিচালনার কাজ শক্ত হাতে চালাতে থাকেন চৌ এনলাই। মাও আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁর সংস্কারের আন্দোলন শুরু করেন ১৯৬৬ সালের অগস্ট মাসে। তিনি এ সময়ে সব স্কুল কলেজ বন্ধ করে দেন এবং লাল প্রহরীদের সব রকমের সনাতন এবং বুর্জোয়া মূল্যবোধকে আক্রমণ করার নির্দেশ দেন। অত্যন্ত দ্রুতগতিতে এই আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। এবং এর প্রথম শিকার হন শিক্ষিত উদারপন্থী লোকেরা, যাঁদের এক কথায় বলা যেতে পারে বুদ্ধিজীবী। তাঁদের নানাভাবে লাঞ্ছিত করা হয়, এমন কি, শারীরিকভাবে নির্যাতন করা হয়। এই নির্যাতন ইহুদীদের ওপর নাৎসিদের প্রথম পাঁচ বছরের অত্যাচারের কথা মনে করিয়ে দিতে পারে। বুদ্ধিজীবী এবং তথাকথিত এলিটদের ওপর অত্যাচার ছাড়াও, দলের নেতৃত্বে বড়ো রকমের পরিবর্তন আসে। দলের সভাপতি লিও শাওচি এবং মাও-এর পূর্বঘোষিত উত্তরাধিকারী দলীয় সাধারণ সম্পাদক দেং শিয়াওপিং ক্ষমতা থেকে অপসারিত হন। ওদিকে, লাল প্রহরীদের মধ্যেও ক্ষমতার প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে বহু উপদল তৈরি হয়। এসব উপদলের আক্রমণ এবং এসব উপদলের অন্তর্বিরোধ থেকে দেশে শান্তি-শৃঙ্খলা অনেকটাই ব্যাহত হয়। এমন কি, এক বছরের মধ্যে দেশের শিল্প-উৎপাদন শতকরা ১২ ভাগে কমে যায়। ১৯৬৮ সাল নাগাদ দেশে এবং কমিউনিস্ট পার্টির ভেতরে আবার শৃঙ্খলা ফিরে আসতে আরম্ভ করে। ১৯৭২ সালে মাও একটি বড়ো রকমের স্ট্রোকে শারীরিক শক্তি হারিয়ে ফেলেন। তা ছাড়া, ১৯৭১ সালে তাঁর ডান হাত লিন এক বিমান দুর্ঘটনায় নিহত হওয়াতেও মাও-এর ক্ষমতা অনেকটা কমে গিয়েছিলো। তাই ১৯৭৩ সালে মাও এবং চৌ মিলে দেংকে আবার ক্ষমতায় ফিরিয়ে আনেন। কিন্তু তার পরেও পার্টির ভেতরে ক্ষমতার লড়াই অব্যাহত থাকে। মোট কথা, সাংস্কৃতিক বিপ-বের সময়ে মানবতাবাদ অথবা মানুষের প্রাত্যহিক সুযোগসুবিধা কোনো বিবেচ্য বিষয়ই ছিলো না, ক্ষমতার লড়াইতে কে হারলো, কে জিতলো, সেটাই বেশি গুরুত্ব লাভ করেছিলো।

[২৫] কমিউনিস্ট সক্রিয়বাদী চারু মজুমদার কৃষক এবং চা-শ্রমিকদের পক্ষে অনেক আগে থেকে আন্দোলন শুরু করলেও, তাঁর নেতৃত্বে, যাকে বলা হয় নকশালবাড়ি আন্দোলন, তা শুরু হয় ১৯৬০-এর দশকের শেষ দিকে। ১৯৬৭ সালে পশ্চিমবঙ্গের মার্কসবাদী কমিউস্টি দলের সঙ্গে মতাদর্শ নিয়ে তাঁর বড়ো রকমের বিরোধ শুরু হয়। এই বিরোধের পরিপ্রেক্ষিতে তিনি ১৯৬৯ সালের পয়লা মে তারিখে মাও-লেনিনবাদী কমিউনিস্ট পার্টির সূচনা করেন এবং অল্প কালের মধ্যে সারা ভারতে সবচেয়ে নাম-করা উগ্রবাদী বিপ-বী নেতা হিশেবে পরিচিত হন। চারু মজুমদার বিশ্বাস করতেন যে, জমির সত্যিকার মালিক হলো কৃষকরা, মধ্য স্বত্বভোগীরা নয়। নকশালবাড়িতে কৃষকরা জমির মালিকানা লাভ করার ঘটনা থেকে এই আন্দোলনের নামই হয় নকশাল আন্দোলন। ১৯৬৯ থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত এই দল অত্যন্ত সুপরিচিত এবং ভীতির বস্তুতে পরিণত হয়। এই আন্দোলনের প্রভাব ভারতের অন্য কয়েকটি রাজ্যেও ছড়িয়ে পড়ে। এমন কি, এখনও অন্ধ্র এবং নেপালে এই দলের প্রভাব রয়ে গেছে। অত্যন্ত মেধাবী অনেক তরুণ-তরুণী এই আন্দোলনে যোগ দেয়। তারা জোতদারদের খতম করাকে শোষণমুক্ত সমাজ গঠনের একটা বড়ো পদক্ষেপ বলে গণ্য করে। কিন্তু চারু মজুমদারের কৃষি বিপ-ব শেষ পর্যন্ত তাঁর সমর্থকদের হাতে প্রধানত ব্যক্তিগত হত্যা এবং তথাকথিত বুর্জোয়া নেতাদের মূর্তির ভাঙার আন্দোলনে পরিণত হয়। বিদ্যাসাগর অথবা রামমোহনের মূর্তিও এ থেকে বাদ যায়নি। ১৯৭২ সালে ক্ষমতাসীন কংগ্রেস সরকারের সঙ্গে স্বাভাবিকভাবেই নকশালবাদীদের বিরোধ তীব্র হয়ে দেখা দেয়। একদিকে, নকশালীরা যেমন তাদের "শ্রেণীশত্রুদের" খুন করার বিচ্ছিন্ন ঘটনা ঘটাতে থাকে, অন্যদিকে তেমনি কংগ্রেস কেন্দ্রীয় রিসার্ভ পুলিশ-সহ নিরাপত্তা বাহিনীর সহায়তায় গ্রেফতার এবং গুপ্ত হত্যার মাধ্যমে এই আন্দোলন দমন করতে চেষ্টা করে। শেষ পর্যন্ত ১৯৭২ সালে চারু মজুমদার গ্রেফতার এবং গ্রেফতারের কদিন পরে কারারুদ্ধ অবস্থায় খুব সম্ভব নিহত হওয়ার পর তরুণদের এই আন্দোলন ব্যর্থ হয়। কিন্তু আন্দোলন থেমে যাওয়ার আগে অনেক সহিংসতার শিকার হয় বহু নিরপরাধ মানুষ।